সামগ্রিক কল্যাণের অর্ডার

সূচিপত্র

ভূমিকা

ইমানুয়েল সতেরো বছর বয়সী এক সাধারণ কিশোর।

একদিন সে তার নিত্যদিনের স্কুলবাসে করে বাড়ি ফিরছিল। বাসচালক—যিনি এই রুটে নতুন ছিলেন—তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ঠিক কী নিয়ে পড়াশোনা করছ?' 'আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট বা শিল্প-ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি ভোকেশনাল কোর্স করছি।' 'আর এতে খরচ কত?' চালক নিজের ষোলো বছর বয়সী ছেলের কথা ভেবেই প্রশ্নটি করলেন। ইমানুয়েল উত্তর দিল: 'কোনো খরচ নেই, কোম্পানিই এর খরচ বহন করে।' 'আর ওখানে তুমি কী করো?' চালকের কৌতূহল তখনো তার ছেলেকে ঘিরেই। ইমানুয়েল জানাল: 'আমরা মেশিন ব্যবহার করে ব্যাগ তৈরি করা শিখি।' 'সেটা তো দারুণ ব্যাপার!' চালক উচ্ছ্বাসের সাথে বললেন। ইমানুয়েল তার কাজের পরিধি সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে বলল: 'শেষ অর্ডারটি ছিল ছয় হাজার ব্যাগের।' অবাক হয়ে চালক জিজ্ঞেস করলেন: 'আর এতে কত সময় লাগে? কতজন লোক লাগে?' ইমানুয়েল সহজভাবে উত্তর দিল: 'আমরা পাঁচজন ছিলাম আর ছয় দিনেই কাজটা শেষ করেছি।' 'অবিশ্বাস্য!' চালক বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তিনি শেষ একটি প্রশ্ন করতেও দ্বিধা করলেন না: 'প্রতিটি ব্যাগের দাম কত পড়ে? আমার এক খালা এগুলো ১৭-তে বিক্রি করেন, কিন্তু দোকানে এগুলোর দাম ৩০।' চালক এবার মনে মনে হিসাব কষতে শুরু করলেন। তিনি শূন্যগুলোর যোগফল মেলালেন—ছয় হাজার ব্যাগের তিনটি শূন্য আর ত্রিশের একটি শূন্য—এবং অবাক হয়ে গেলেন। তিনি আরও কিছুক্ষণ ভাবলেন এবং আনুমানিক একটি হিসাব দাঁড় করিয়ে দেখলেন যে মোট অঙ্কটা প্রায় দুই লাখের কাছাকাছি দাঁড়াচ্ছে। আর যখন মনে করলেন যে তারা পাঁচজন ছিল—অর্থাৎ মাথাপিছু প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা—তখন তিনি আরও বেশি অবাক হলেন; তাও আবার মাত্র এক সপ্তাহের কাজের বিনিময়ে। তিনি গভীর একটা শ্বাস নিলেন, খরচের জন্য পঞ্চাশ শতাংশ বাদ দিলেন এবং শেষমেশ নিজের আয়ের সাথে ইমানুয়েলের সম্ভাব্য আয়ের তুলনা করে নিজের জন্য এবং সেই সরল ও কঠোর পরিশ্রমী ইমানুয়েলের জন্য এক ধরণের করুণা অনুভব করলেন।

সাধারণের কল্যাণের পক্ষে ক্ষমতার ভারসাম্য পরিবর্তনের জন্য এই কাজটি জরুরি। ঠিক এই মুহূর্তেই বিষয়টি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, কীভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন আমাদের ওপর ক্ষুধা, যুদ্ধ, বিবাদ এবং স্বৈরাচারী নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দেয়। 'সর্বজনীন কল্যাণ-ব্যবস্থা' সবার জন্যই, তবে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম এবং অনাগত প্রজন্মের জন্য। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের নেওয়া সিদ্ধান্ত ও তাদের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থানের পরিণাম আপনাদেরই ভোগ করতে হবে। আমরা কেমন মানুষ হয়ে উঠতে চাই? এমন এক সমাজ যেখানে মানুষ দাস ও সম্রাটের মতো বিভক্ত—নাকি এমন এক সমাজ যেখানে আমরা সবাই মিলে সবার জন্য মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করি?

প্রথম পর্ব — বর্তমান বিশ্বের সমস্যা

১. মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে ক্ষমতা

আসলে বিশ্বকে কারা শাসন করে? জনগণ, নাকি এমন এক সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যাদের হাতে সম্পদ, প্রভাব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কুক্ষিগত? এটি কেবল কোনো রাজনৈতিক বিষয় নয়, বরং আমাদের সময়ের অধিকাংশ বৈষম্যের কাঠামোগত ভিত্তি। এমন এক সমাজে যেখানে সিদ্ধান্ত নেয় গুটিকয়েক মানুষ আর তার ফলাফল ভোগ করতে হয় বিশাল জনগোষ্ঠীকে, সেখানে ভবিষ্যৎ আর কোনো যৌথ প্রচেষ্টার বিষয় থাকে না; বরং তা ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা নির্ধারিত হতে শুরু করে।

বর্তমানে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও তথ্যগত ক্ষমতা সীমিত কিছু গোষ্ঠীর—যেমন বড় বড় কর্পোরেশন, বিত্তবান অভিজাত শ্রেণি, বিশাল গণমাধ্যম গোষ্ঠী এবং বদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক বলয়—হাতে ক্রমেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। ক্ষমতার এই কেন্দ্রীভবন মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে—খাদ্যের দাম থেকে শুরু করে বাসস্থান, কর্মসংস্থান ও শিক্ষার সুযোগ—সবকিছুতেই এর প্রভাব পড়ে। যখন সম্পদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে থাকে, তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে

এমন সব নিয়মের অধীনে জীবনযাপন করতে হয় যা তৈরিতে তাদের কোনো ভূমিকা ছিল না।

বর্তমান মডেলটি এক গভীর বিকৃত এবং নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য যুক্তিকে সামনে নিয়ে আসে। পুঁজির কেন্দ্রীভবন কেবল অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এটি রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং এমনভাবে আইন, জননীতি ও রাষ্ট্রের অগ্রাধিকারগুলো নির্ধারণ করে যাতে সেই কাঠামোটিই সুরক্ষিত থাকে যা তাদের উত্থানের কারণ ছিল। এভাবেই সম্পদ ক্ষমতার জন্ম দেয়, ক্ষমতা নতুন রীতিনীতি তৈরি করে এবং সেই রীতিনীতিগুলো সম্পদকে একই গোষ্ঠীর হাতে ধরে রাখে—ফলে ক্ষমতার পুনরুৎপাদনের একটি বদ্ধ চক্র তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়ার চড়া মূল্য প্রতিদিন দিতে হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে—অপ্রতুল মজুরি, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা, সীমিত শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং সামাজিক অগ্রগতির প্রকৃত সুযোগের অভাবের মধ্য দিয়ে। একদিকে যখন গুটিকয়েক মানুষ বিলাসিতা, সম্পদ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কুক্ষিগত করে, অন্যদিকে তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ বৈষম্যের নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়: ক্ষুধা, চরম ক্লান্তি, শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা এবং সবচেয়ে চরম ক্ষেত্রে—কাঠামোগত বর্জনের কারণে সৃষ্ট সামাজিক ও অস্তিত্বগত বিলুপ্তি বা মৃত্যু।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার প্রকৃত পুনর্বণ্টনের ওপর ভিত্তি করে কাঠামোগত পরিবর্তন অপরিহার্য। এই রূপান্তরটি হতে হবে বাস্তবসম্মত, ধাপে ধাপে এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুসংগঠিত উপায়ে। এর প্রথম ধাপ হলো এমন সব কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা রাজনৈতিক অর্থায়ন, সম্পদের কেন্দ্রীভবন এবং আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক প্রভাবের বিষয়ে জনস্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। এরপর প্রয়োজন সিদ্ধান্ত গ্রহণের বাধ্যতামূলক ক্ষমতা বা আইনি বাধ্যবাধকতা-সহ কমিউনিটি কাউন্সিল, স্থানীয় সভা এবং অংশগ্রহণমূলক বাজেট কাঠামোগুলোকে শক্তিশালী করা। এরপর, এমন একটি প্রগতিশীল ও সম্পদ পুনর্বণ্টনকারী কর ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে যা সম্পদের চরম কেন্দ্রীভবন হ্রাস করতে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো ও ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরাসরি বিনিয়োগের অর্থ সংস্থান করতে সক্ষম। এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার স্বল্পমেয়াদী পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত

করতে হবে। মধ্যমেয়াদে প্রয়োজন হবে রাজস্ব নীতির মাধ্যমে সম্পদের পুনর্বণ্টন এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি। আর দীর্ঘমেয়াদে লক্ষ্য হবে বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করা, যেখানে ক্ষমতা কোনো ব্যক্তিগত সম্পদে সীমাবদ্ধ না থেকে সমষ্টির কল্যাণের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করবে।

এটা স্পষ্ট যে, বিদ্যমান কাঠামো থেকে যারা বর্তমানে সুবিধা ভোগ করছে, তাদের কাছ থেকে প্রতিরোধ আসবেই। ক্ষমতার যেকোনো পুনর্বণ্টন প্রক্রিয়াই সেই সব গোষ্ঠীর বিরোধিতার মুখে পড়ে যারা এই ভারসাম্যহীনতা বজায় রেখে লাভবান হয়। তা সত্ত্বেও, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের বিশেষ সুবিধা বা 'প্রিভিলেজ' টিকিয়ে রাখার জন্য যখন বহু মানুষের জীবনকে বলি দেওয়া হয়, তখন কোনো সমাজই প্রকৃত স্থিতিশীলতা, ন্যায়বিচার কিংবা একটি টেকসই ভবিষ্যতের আশা করতে পারে না। বিদ্যমান কাঠামো থেকে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীগুলোর এই প্রতিরোধ কেবল প্রকাশ্য কোনো রূপেই সীমাবদ্ধ থাকে না। যেসব খাতে সম্পদ, প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব এবং নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকে, তারা একই সাথে একাধিক কৌশল অবলম্বন করে: জনপরিসরের বিতর্ককে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া, ক্ষমতার পুনর্বণ্টনকে অবৈধ বা অযৌক্তিক প্রতিপন্নকারী বয়ান বা আখ্যানকে অর্থায়ন করা, রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা, আদালতের মাধ্যমে প্রস্তাবিত সংস্কারকে বেছে বেছে চ্যালেঞ্জ করা এবং পরিবর্তনের বিষয়ে সমাজে ভীতি সঞ্চারের জন্য গণমাধ্যমকে ব্যবহার করা। বর্তমান ব্যবস্থা ক্ষমতার পুনর্বণ্টন সংক্রান্ত যেকোনো প্রস্তাবকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, কর্মসংস্থান, প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা কিংবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করে; এর মাধ্যমে তারা বিশেষ সুবিধাকেই স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই প্রতিরোধ কখনোই সরাসরি নিজেদের স্বার্থ রক্ষার প্রচেষ্টা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে না; বরং তা কারিগরি আলোচনা, আর্থিক বিচক্ষণতা, আনুষ্ঠানিক আইনি বৈধতা কিংবা তথাকথিত জাতীয় স্বার্থ রক্ষার আবরণে নিজেকে আড়াল করে রাখে।

তাই, এই রূপান্তর কোনো বিমূর্ত আমূল পরিবর্তন বা একক কোনো বড় রাজনৈতিক ঘটনার ওপর নির্ভর করতে পারে না। একে গড়ে তুলতে হবে ছোট, ধারাবাহিক এবং অপরিবর্তনীয় পদক্ষেপের একটি কর্মসূচির মাধ্যমে, যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রগুলোতে ধীরে ধীরে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হবে।

প্রথমত, সহজবোধ্য রাজনৈতিক শিক্ষা, সুস্পষ্ট জন-আলোচনা এবং কাঠামোগত বড় বিষয়গুলোর সাথে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের (যেমন—মজুরি, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবহন ও শিক্ষা) সরাসরি সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে আমাদের একটি সামাজিকভাবে সচেতন সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী গড়ে তুলতে হবে। যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ উপলব্ধি করবে যে ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ তাদের জীবনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলছে, তখন এই কর্মসূচি আর কেবল তাত্ত্বিক বিষয় হয়ে থাকবে না, বরং তা একটি বৈধ ও জোরালো গণদাবিতে পরিণত হবে। দ্বিতীয় ধাপটি সম্পন্ন হতে হবে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরেই: স্থানীয় পরিষদ, কমিউনিটি সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়, পৌরসভা, গণ-ফোরাম এবং অংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রক্রিয়ার ওপর ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাব বিস্তার করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রবেশ করতে হবে একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকে—যেখানে জনগণের সমর্থন বা বৈধতা সবচেয়ে দৃশ্যমান এবং যেখানে অভিজাত শ্রেণির প্রতিরোধকে নিষ্ক্রিয় করা সবচেয়ে কঠিন। বাজেটের স্বচ্ছতা, সামাজিক তদারকি, সম্পদের আঞ্চলিক পুনর্বণ্টন এবং জনসেবার সম্প্রসারণের মতো ছোট ছোট স্থানীয় বিজয়গুলো বাস্তব দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করে; এগুলো সমষ্টিগত আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে এবং 'পরিবর্তন অসম্ভব'—এমন ধারণাকে দুর্বল করে দেয়।

এরপর, সামাজিক সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে প্রাতিষ্ঠানিক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রূপান্তর করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এর অর্থ হলো জনপ্রিয় সমর্থনকে সুসংগঠিত প্রতিনিধিত্বে রূপান্তর করা—যার মধ্যে থাকবে পর্যায়ক্রমিক আইনি কর্মসূচি, সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং সংস্কারের জন্য একটি ধারাবাহিক সময়সূচি। অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপ এমন হতে হবে যা পুরোনো ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয়: যেমন—পূর্ণাঙ্গ জনস্বচ্ছতা নিশ্চিতকারী নিয়মকানুন প্রণয়ন, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক প্রভাব নির্মূল, স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রগতিশীল রাজস্ব পুনর্বণ্টন। এর কৌশলগত যুক্তি হলো পরিবর্তনকে ক্রমপুঞ্জীভূত করা, যাতে পরবর্তী প্রতিটি পদক্ষেপ তার আগের পদক্ষেপের অর্জিত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সুবিধাপ্রাপ্ত যে কাঠামোটি নিজে থেকে নতি স্বীকার করে না, তাকে মোকাবিলা করতে হলে প্রয়োজন সংখ্যাগরিষ্ঠের সুসংগঠিত শক্তি—যার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে কৌশলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে

আনা এবং সংস্কার কার্যক্রমকে অবিচলভাবে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব। ঐতিহাসিক রূপান্তর কেবল নৈতিক তাগিদ থেকে আসে না; বরং তা আসে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা থেকে—যতক্ষণ না ক্ষমতার পুনর্বণ্টন কেবল একটি প্রস্তাবের গণ্ডি পেরিয়ে একটি সুদৃঢ় বাস্তবে পরিণত হয়।

এই রূপান্তরের সুফল হতে পারে সুদূরপ্রসারী। সামাজিক অংশগ্রহণের পরিধি বাড়লে সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের প্রকৃত চাহিদার প্রতিফলন ঘটবে এবং কেন্দ্রীকরণের ফলে সৃষ্ট অসামঞ্জস্যগুলো দূর হবে। এর ফলে বৈষম্য কমবে, প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা পুনরুদ্ধার হবে এবং সামাজিক উদ্ভাবনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে, কারণ আরও বেশি মানুষ যৌথ সমাধানের পথে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে শুরু করবে। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকার বিষয়টি নিয়ে যে বিতর্ক, তা আসলে ভবিষ্যতের বৈধতা নিয়েই বিতর্ক। ক্ষমতার পুনর্বণ্টন এখন আর কেবল তাত্ত্বিক কোনো সম্ভাবনা নয়; সামাজিক রূপান্তরের যেকোনো বলিষ্ঠ উদ্যোগের জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা—যা অত্যন্ত জরুরি ও অনিবার্য।

২. বর্জনের সামাজিক স্থাপত্য

কেন, এমনকি যে সমাজগুলি নিজেদেরকে আধুনিক এবং মেধাতান্ত্রিক বলে দাবি করে, সেখানেও এত মানুষ এখনও নিয়তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যা প্রায় পূর্বনির্ধারিত? এটি এমন একটি কাঠামো যা নীরব অথচ গভীরভাবে বদ্ধ, যেখানে ক্ষমতা, প্রতিপত্তি এবং সুযোগের অ্যাক্সেস শীর্ষে কেন্দ্রীভূত থাকে, যখন ভিত্তিটি তার সুবিধার আনুপাতিক অংশ উপভোগ না করে সিস্টেমটিকে টিকিয়ে রাখে। একটি রূপকের চেয়েও, সামাজিক পিরামিড সমষ্টিগত জীবনের মধ্যে সম্পদ, প্রভাব এবং স্বীকৃতির অসম বণ্টনের প্রতিনিধিত্ব করে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে, এই কাঠামোগুলি আয় বণ্টন, শিক্ষার অসম মান, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন এবং পেশাদার নেটওয়ার্কগুলিতে নিজেদেরকে প্রকাশ করে। সুবিধাপ্রাপ্ত স্তরের পরিবারগুলি কেবল সম্পদই নয়, সাংস্কৃতিক পুঁজি, সংযোগ এবং সামাজিক বৈধতাও দেয়, যখন প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলি শৈশব থেকে কাঠামোগত বাধার সম্মুখীন হয়। এই সমস্যাটি

সামাজিক গতিশীলতার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে: যখন একজনের অবস্থানের মূল অবস্থান ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার চেয়ে বেশি ওজন বহন করে, তখন সমান সুযোগের প্রতিশ্রুতি একটি ভঙ্গুর এবং অলীক বক্তৃতায় পরিণত হয়।

বর্তমান মডেলটি গভীরভাবে স্ব-স্থায়ী এবং ঐতিহাসিকভাবে বর্জনীয়। কিছু নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে বস্তুগত, সাংস্কৃতিক এবং প্রতীকী সম্পদের ঘনত্ব শুধুমাত্র বর্তমানের অসমতাই তৈরি করে না, বরং প্রজন্ম জুড়ে এর ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে। সম্পদ, মানসম্পন্ন শিক্ষা, প্রভাবের নেটওয়ার্ক, ক্ষমতার অবস্থানে অ্যাক্সেস এবং সামাজিক বৈধতা উত্তরাধিকার হিসাবে গৃহীত হয়, এমন কাঠামোকে একীভূত করে যেখানে শীর্ষস্থানীয়রা তাদের অবস্থান রক্ষা করে এবং নীচের লোকেরা কার্যত অনতিক্রম্য বাধার অধীন থাকে। ফলাফল হল একটি স্তরীভূত সমাজ, যেখানে ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা নিয়ম হিসাবে বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যতিক্রম হয়ে যায়। আরও গুরুতর বিষয় হল যে এই কাঠামোটি বৈষম্যকে স্বাভাবিক বলে মনে করে, যেন এটি গ্রহণযোগ্য ছিল কেউ নেতৃত্বের জন্য জন্মগ্রহণ করে এবং অন্যরা অদৃশ্যতার জন্য নিন্দা করে।

কাঠামোগত সহিংসতা মানুষের জীবনে বাস্তব উপায়ে নিজেকে প্রকাশ করে। যে শিশু একই শিক্ষার অ্যাক্সেস ছাড়াই জীবন শুরু করে, পর্যাপ্ত পুষ্টি ছাড়াই এবং বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণির শিশুদের প্ররোচিত করে এমন সহায়তা নেটওয়ার্ক ছাড়াই জীবন শুরু করে তার মধ্যে এটা স্পষ্ট। যুবকদের মধ্যে এটা স্পষ্ট যে, তাদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, তাদের জন্য দরজা বন্ধ হয়ে গেছে কারণ তাদের একটি মর্যাদাপূর্ণ উপাধি, সামাজিক মূলধন বা সঠিক চেনাশোনাগুলির সদস্যতার অভাব রয়েছে। এটি এমন শ্রমিকের মধ্যে পাওয়া যায় যারা তাদের সম্ভাবনাকে যোগ্যতার অভাবের কারণে সীমাবদ্ধ দেখেন না, বরং সামাজিক কাঠামোর দ্বারা যা তাদের স্থায়ীভাবে নীচে রাখে। যারা এই বৈষম্যের জন্য মূল্য দিতে হয়, তারা সর্বোপরি শহরতলির পরিবার, ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক গোষ্ঠী এবং অসম সুযোগের ভারে বেড়ে উঠা প্রজন্ম। এই যুক্তিটি গুরুতর বস্তুগত যন্ত্রণার জন্ম দেয়: দীর্ঘস্থায়ী দারিদ্র্য, পেশাদার বর্জন, মানসিক যন্ত্রণা এবং মৃত্যু, মর্যাদার ন্যূনতম শর্তগুলিতে অ্যাক্সেস থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে। এই মডেল থেকে যারা লাভবান হন তারা হলেন পিরামিডের শীর্ষে যারা এমন একটি সিস্টেমের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে উপকৃত হন যা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিশেষাধিকারকে সামাজিক বৈধতায় রূপান্তরিত করে।

এই নিষ্ঠুর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে, সামাজিক কাঠামোর সমতলকরণ এবং সুযোগের বাস্তব সম্প্রসারণের উপর ভিত্তি করে একটি নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন। প্রথম ধাপ হল শৈশবকাল থেকেই উচ্চ-মানের শিক্ষার কার্যকর সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, কারণ এখান থেকেই বৈষম্য শিকড় গাড়তে শুরু করে। পরবর্তীতে, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন, খাদ্য এবং সংযোগে সর্বজনীন অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার জন্য দৃঢ় নীতিগুলি প্রয়োগ করতে হবে, যাতে সামাজিক পটভূমি আর একজনের জীবনের সূচনা বিন্দু নির্ধারণ না করে। বিশেষাধিকারের বংশগত প্রক্রিয়া যেমন চরম সম্পদ কেন্দ্রীকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক নেটওয়ার্কের একচেটিয়া আধিপত্য এবং প্রতিপত্তির পদে প্রবেশের ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক বাধাগুলি রোধ করাও অপরিহার্য।

প্রস্তাবটি হল নেটওয়ার্কের যুক্তি দিয়ে পিরামিডের যুক্তি প্রতিস্থাপন করা। ব্যবহারিক পরিভাষায়, এর অর্থ এমন একটি সমাজ গড়ে তোলা যেখানে প্রভাব, জ্ঞান এবং সুযোগগুলি সম্প্রদায়, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদের মধ্যে অনুভূমিকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। কমিউনিটি স্পেস, স্থানীয় সমবায়, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবলিক ভোকেশনাল ট্রেনিং সিস্টেমগুলিকে সামাজিক স্বীকৃতি এবং প্রতীকী শক্তির পুনর্বণ্টনের উপকরণ হিসাবে কাজ করা উচিত। ধারণাটি প্রতিভা, পেশা বা পছন্দের পৃথক পার্থক্য অস্বীকার করা নয়, তবে এই পার্থক্যগুলিকে মানুষের গোষ্ঠীর মধ্যে স্থায়ী বাধায় পরিণত হওয়া থেকে প্রতিরোধ করা।

এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অনিবার্যভাবেই বাধার সম্মুখীন হতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় এখানে বাধার ধরনটি অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও জটিল; কারণ বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত কাঠামোগুলো কেবল বস্তুগত সম্পদের ওপর নয়, বরং বৈধতা প্রদানের প্রতীকী কৌশলের ওপরও টিকে থাকে। আধুনিক বর্ণপ্রথা বা শ্রেণি-কাঠামো খুব কমই নিজেদের সরাসরি সেভাবে উপস্থাপন করে; বরং তারা মেধা, ঐতিহ্য, উৎকর্ষ, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং তথাকথিত প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতার আড়ালে নিজেদের লুকিয়ে রাখে। এই ব্যবস্থাটি প্রভাব বিস্তারের একই নেটওয়ার্ক বজায় রাখা, মানসম্মত শিক্ষায় অসম সুযোগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সম্পদের কেন্দ্রীভবন এবং পেশাগত, রাজনৈতিক ও অ্যাকাডেমিক মর্যাদাপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রবেশের অনানুষ্ঠানিক বাধা টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে সেই পিরামিড-সদৃশ কাঠামোকে রক্ষা করতে চায়। অসমতাকে স্বাভাবিক হিসেবে মেনে নেওয়ার প্রবণতা থেকেই এই বাধার সৃষ্টি হয়; এর ফলে মনে হতে পারে যে প্রতিটি গোষ্ঠী যে

অবস্থানে রয়েছে তা কেবল তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টারই ফল, অথচ বাস্তবে তা অনেকাংশেই নির্ধারিত হয় তাদের যাত্র শুরুর অবস্থান বা সামাজিক পটভূমির দ্বারা।

সামাজিক ন্যায়বিচার বিষয়ক কেবল নৈতিক যুক্তির ওপর নির্ভর করে এই পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট, ছোট ও ধারাবাহিক পদক্ষেপ, যা পিরামিড কাঠামোর স্বয়ংক্রিয় পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়াকে ধাপে ধাপে দুর্বল করতে সক্ষম। প্রথম পদক্ষেপটি হলো অসমতার মূলে আঘাত করা—যার জন্য প্রয়োজন শৈশবের যত্ন ও পরিচর্যার সর্বজনীন ও কার্যকর ব্যবস্থা, মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা, স্কুলে পুষ্টিকর ও পূর্ণাঙ্গ আহারের ব্যবস্থা, সংযোগ বা প্রযুক্তির সুবিধা এবং এমন সব নীতি যা জীবনের শুরু থেকেই অসমতাকে স্থায়ী রূপ নেওয়া থেকে বিরত রাখে। ঠিক এই পর্যায়েই সমাজের বৃহত্তর অংশ বাস্তবিকভাবে উপলব্ধি করতে শুরু করে যে, সুযোগের সমতা কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়, বরং স্বাধীনতার জন্য এটি একটি অপরিহার্য শর্ত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে মনোযোগ দিতে হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা এবং মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধীরে ধীরে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার ওপর। এর অর্থ হলো বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি চাকরি, গবেষণা কেন্দ্র, অর্থনীতির কৌশলগত খাত এবং সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের ভূমিকায় সামাজিক অগ্রগতির সুযোগ সম্প্রসারিত করা। নতুন কোনো গোষ্ঠী যখন এসব ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন তা পিরামিডের বংশানুক্রমিক কাঠামোর যুক্তিকে দুর্বল করে এবং এই রূপান্তর প্রক্রিয়ার বৈধতাকে শক্তিশালী করে। অনুদান, সামাজিক কোটা, সরকারি মেন্টরিং বা পরামর্শদান কর্মসূচি, পেশাগত ক্ষেত্রে প্রবেশের বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় কারিগরি প্রশিক্ষণের মতো প্রাতিষ্ঠানিক অর্জনগুলো আধুনিক বর্ণপ্রথা বা শ্রেণি-কাঠামোর পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্থায়ী ফাটল ধরিয়ে দেয়।

এরপর এই ফাটলগুলোকে কাঠামোগত রূপান্তরে পরিণত করা জরুরি। সামাজিক গতিশীলতা বা উত্তরণ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন, কর সংস্কারের দাবি জানানো, সম্পদের চরম কেন্দ্রীভবন রোধ এবং বিশেষ সুবিধার অবাধ বংশানুক্রমিক হস্তান্তর সীমিত করার প্রক্রিয়ায় জনগণের বৃহত্তর অংশকে সম্পৃক্ত করতে হবে। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেন প্রতিটি অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জীভূত এবং সামাজিকভাবে দৃশ্যমান হয়; কারণ যত বেশি মানুষ ওপরের দিকে উঠে আসবে, পড়াশোনা করবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পদে আসীন হবে এবং নিজেদের সম্প্রদায়কে বদলে দেবে, ততই 'শীর্ষস্থানটি প্রাকৃতিকভাবেই কেবল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য নির্ধারিত'—এই প্রচলিত ধারণাটি তার ভিত্তি হারাতে শুরু

করবে। যে সমাজ আধুনিক বর্ণপ্রথা বা জাতিভেদকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়, তা কেবল তার অভ্যন্তরীণ ন্যায়বিচারকেই ক্ষুণ্ন করে না, বরং উদ্ভাবন, সংহতি এবং ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার সক্ষমতাকেও দুর্বল করে দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত জন্মই কারো ভাগ্যের পরিধি নির্ধারণ করতে থাকে, ততক্ষণ স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি অপূর্ণই থেকে যাবে। প্রকৃত পরিবর্তনের সূচনা তখনই হয়, যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কেবল সেই পিরামিড-সদৃশ কাঠামো টিকিয়ে রাখার কাজ থেকে সরে এসে ধাপে ধাপে তার গঠনশৈলী নতুন করে সাজাতে শুরু করে।

সামাজিক স্তরের কঠোরতা কমিয়ে আনলে অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়, সম্মিলিত উদ্ভাবনী শক্তি জোরদার হয় এবং সমাজে নিজেদের অন্তর্ভুক্তির বোধ বা 'আপনজন' হওয়ার অনুভূতি বাড়ে। আগে যেসব মানুষ তাদের সামাজিক পটভূমির কারণে সীমাবদ্ধ ছিলেন, তারা তখন অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আরও সক্রিয়ভাবে অবদান রাখতে শুরু করেন, যার ফলে আরও ভারসাম্যপূর্ণ ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। এছাড়া, সামাজিক বিভাজন কমে এলে উত্তেজনা হ্রাস পায়, সম্প্রদায়ের মধ্যে সংহতি দৃঢ় হয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতা ও বৈধতা বৃদ্ধি পায়। আধুনিক বর্ণপ্রথা ও পিরামিড-সদৃশ কাঠামো নিয়ে আলোচনার অর্থ হলো মানুষের সহাবস্থানের মূল কাঠামোটি নিয়েই আলোচনা করা। জন্মলগ্নে নির্ধারিত অবস্থানই যদি কারো ভবিষ্যতের পরিধি নির্ধারণ করতে থাকে, তবে কোনো সমাজই দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতা ও ন্যায়বিচারের আশা করতে পারে না। এই কাঠামোগুলোকে অতিক্রম করা কেবল একটি নৈতিক আদর্শই নয়, বরং এমন একটি সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য ঐতিহাসিক আবশ্যকতা—যা হবে প্রকৃত অর্থেই গতিশীল, গ্রহণযোগ্য এবং সম্মিলিত উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবেদিত।

৩. পুঁজিবাদী আকাঙ্ক্ষা ও বৈশ্বিক সংকট

মানুষের আকাঙ্ক্ষা যখন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যুক্তিতে রূপান্তরিত হয়, তখন তা কতটা ব্যাপকভাবে এই গ্রহকেই অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে? এটি একটি অস্বস্তিকর পর্যবেক্ষণ: মুনাফা, ভোগ, ক্ষমতা ও সম্প্রসারণের নিরন্তর ধাওয়া আজকের প্রধান সংকটগুলোর মূল চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। ব্যক্তি বা করপোরেট আকাঙ্ক্ষা যখন কোনো নৈতিক বা কাঠামোগত সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয় না, তখন তার

প্রভাব জাতীয় সীমানা ছাড়িয়ে বৈশ্বিক পরিসরে সামাজিক, পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে শুরু করে।

এই প্রবণতাটি বারবার ফিরে আসা আর্থিক সংকট, প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যধিক আহরণ, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়। অবিরাম প্রবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা এবং সাফল্য পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে ভোগবিলাসের মহিমান্বিতকরণ—এই দুইয়ের সংমিশ্রণ উৎপাদন ব্যবস্থা, বাস্তুতন্ত্র এবং সামাজিক সম্পর্কের ওপর প্রতিনিয়ত চাপ সৃষ্টি করে। এর বাস্তব প্রভাব দৈনন্দিন জীবনে অনুভূত হয়: মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, জনগোষ্ঠীর বাস্তুচ্যুতি এবং পরিবেশগত বিপর্যয়—এসবই এমন এক মডেলের পরিণতি, যা কোনো যৌথ নিয়ন্ত্রণ বা ভারসাম্য ছাড়াই কেবল সীমাহীন আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত।

সমস্যাটি নিহিত রয়েছে এর নিজস্ব অভ্যন্তরীণ যুক্তির মধ্যে; এই যুক্তি মানুষের সম্পদ সঞ্চয়, মর্যাদা ও আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকে বৈশ্বিক অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত করে। শুরুতে যা নিরাপত্তা বা স্বীকৃতির জন্য ব্যক্তির নিজস্ব তাড়না হিসেবে বিবেচিত হতে পারত, তা-ই এখন পুরো ব্যবস্থার প্রধান চালিকাশক্তির মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। সম্পদ এখন আর কেবল মাধ্যম নয়, বরং নিজেই লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে; প্রবৃদ্ধি আর কোনো হাতিয়ার নয়, বরং এক আবশ্যিক শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিপরীতমুখী পরিস্থিতির ফলে এমন এক কাঠামোর উদ্ভব হয়েছে যা নৈতিক, সামাজিক বা পরিবেশগত মানদণ্ডের তোয়াক্কা না করে সীমাহীন সম্প্রসারণ, অবিরাম ভোগ এবং সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনকে পুরস্কৃত করে। এর প্রত্যক্ষ ফল হলো মানুষ, সম্পদ ও প্রতিষ্ঠানের অত্যধিক শোষণ; এর ফলে এমন সব সংকটের সৃষ্টি হয় যা বিচ্ছিন্নভাবে নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে—যেমন অর্থনৈতিক মন্দা, পরিবেশগত বিপর্যয়, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, ভূ-রাজনৈতিক সংঘাত এবং ব্যাপক সামাজিক অস্থিতিশীলতা। এদিকে, এই মডেল থেকে অর্জিত মুনাফা বড় বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠান, আর্থিক গোষ্ঠী এবং এমন সব মহলের হাতে কুক্ষিগত থাকে, যারা ভোগের ক্রমাগত সম্প্রসারণ ও বৈশ্বিক সম্পদ শোষণের মাধ্যমে সরাসরি লাভবান হয়।

ব্যবস্থাটি যত বেশি সীমাহীন প্রবৃদ্ধিকে পুরস্কৃত করে, ততই তা এমন সব কাঠামোগত দুর্বলতা তৈরি করে যার ভার অনিবার্যভাবে সাধারণ মানুষের ওপরই পড়ে। লাগামহীন সম্প্রসারণের প্রতিটি নতুন চক্রের সাথে পরিবেশ, শ্রমশক্তি এবং গণতান্ত্রিক

প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপ বাড়তে থাকে। এর ফলে বিশ্ব এক স্থায়ী সংকটের অবস্থায় নিপতিত হয়, যেখানে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের অতিরিক্ত ভোগের আকাঙ্ক্ষা বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য বস্তুগত নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করে। এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যর্থতার বিষয় নয়, বরং এমন এক যুক্তির ফল যা ক্রমাগত সম্প্রসারণকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে নিজের মধ্যেই অস্থিতিশীলতা তৈরি করে। টেকসই সীমার ওপর ভিত্তি করে এবং সামাজিক অগ্রাধিকারগুলোর মৌলিক পুনর্নির্ধারণের মাধ্যমে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রথমত, অর্থনৈতিক সাফল্য নির্ধারণকারী বর্তমান পরিমাপকগুলোকে আমাদের পর্যালোচনা করতে হবে। জিডিপি (GDP) প্রবৃদ্ধি বা ভোগ বৃদ্ধির মতো কেবল সংখ্যাতাত্ত্বিক সূচকগুলোর পাশাপাশি—এবং ধীরে ধীরে সেগুলোর পরিবর্তে—জীবনযাত্রার মান, খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশগত ভারসাম্য, জনস্বাস্থ্য এবং বৈষম্য হ্রাসের মতো বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে নতুন পরিমাপক প্রবর্তন করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে এর জন্য প্রয়োজন এমন আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কাঠামো গড়ে তোলা, যা শোষণমূলক বা অনৈতিক কর্মকাণ্ড রোধ করতে সক্ষম হবে; বড় বড় কর্পোরেশনের ওপর সামাজিক ও পরিবেশগত দায়বদ্ধতা আরোপ করবে; এবং কৌশলগত খাতগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক টেকসই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে।

প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক মডেলটিতে 'শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধির জন্য প্রবৃদ্ধি'—এই ধারণার পরিবর্তে ভারসাম্য ও পরিমিতির নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। উৎপাদন, ভোগ ও উন্নয়নকে অবশ্যই সমষ্টিগত কল্যাণ এবং জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় প্রয়োজনীয় সম্পদের সংরক্ষণের অধীন হতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন বৃত্তাকার অর্থনীতি (circular economy), টেকসই উৎপাদন, উপকরণের পুনঃব্যবহার ও পরিচ্ছন্ন শক্তির প্রসার ঘটানো এবং এমন সব সরকারি নীতি প্রণয়ন করা যা অত্যধিক ভোগ ও 'পরিকল্পিত অকেজোকরণ' (planned obsolescence)—অর্থাৎ পণ্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে দ্রুত অকেজো বা সেকেলে করে ফেলার প্রবণতা—কে নিরুৎসাহিত বা দণ্ডনীয় করবে। সাংস্কৃতিক পর্যায়ে এই রূপান্তরের জন্য প্রয়োজন মানসিকতার আমূল পরিবর্তন: সম্পদ বা বস্তুগত সঞ্চয়ের ওপর ভিত্তি করে সাফল্য পরিমাপের ধারণা থেকে সরে এসে পরিমিতি, মর্যাদা এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতার সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে যাওয়া।

বস্তুগত জীবনের অব্যাহত সম্প্রসারণ ও অবাধ পণ্যকরণের মাধ্যমে যারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়, তাদের কাছ থেকে প্রতিরোধের বিষয়টি প্রত্যাশিতই; আর এই প্রতিরোধ

সাধারণত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক—সব ক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়। বৃহৎ আর্থিক গোষ্ঠী, বহুজাতিক কর্পোরেশন, আগ্রাসী জ্বালানি খাত এবং নিরন্তর ভোগের ওপর নির্ভরশীল বাজার ব্যবস্থা—এরা সবাই সরকারের ওপর জোরালো প্রভাব বিস্তার, জনমত গঠনে অর্থায়ন এবং নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোর ওপর চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে বর্তমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায়। তাদের একটি নিয়মিত কৌশল হলো—অবারিত প্রবৃদ্ধির ওপর যেকোনো ধরনের সীমাবদ্ধতাকে কর্মসংস্থান, উদ্ভাবন, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবং জাতীয় উন্নয়নের জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরা। অবাধ মুনাফার এই সুরক্ষা প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক স্বার্থকে এক ধরণের সমষ্টিগত প্রয়োজনীয়তা হিসেবে উপস্থাপন করে।

বর্তমান ব্যবস্থাটি এমনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে যেখানে মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় ভোগ, সম্পদ আহরণ এবং সম্প্রসারণের ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে। তাই পরিবর্তনের জন্য কেবল অর্থনৈতিক সংস্কারই যথেষ্ট নয়; বরং সমষ্টিগত মানসিকতা গঠনকারী ক্ষেত্রগুলোতে—যেমন স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, গণমাধ্যম, নগর পরিকল্পনা এবং সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচিতে—ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। প্রথম পদক্ষেপটি হতে হবে অবারিত ভোগ এবং বাস্তব বস্তুগত সংকটের (যেমন—মুদ্রাস্ফীতি, পরিবেশগত বিপর্যয়, চক্রাকার বেকারত্ব, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ও চরম আবহাওয়া পরিস্থিতি) মধ্যকার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নিয়ে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলা। যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বুঝতে পারবে যে বৈশ্বিক সংকটগুলো কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং একটি অনিয়ন্ত্রিত ও সম্প্রসারণবাদী মডেলের পূর্বাভাসযোগ্য পরিণতি, তখনই পরিবর্তনের পক্ষে জনসমর্থন তৈরির পথ প্রশস্ত হবে।

দ্বিতীয় ধাপটি হলো—ব্যবস্থার ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী খাতগুলোতে (যেমন—জ্বালানি, প্রাকৃতিক সম্পদ, আর্থিক ব্যবস্থা এবং প্রধান উৎপাদন শৃঙ্খল) প্রগতিশীল নীতিমালা বা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর করা। বাধ্যতামূলক টেকসই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, পরিবেশগত ক্ষতির জন্য কর আরোপ, আগ্রাসী ফটকাবাজারি নিষিদ্ধকরণ, বৃত্তাকার অর্থনীতির (circular economy) জন্য প্রণোদনা এবং পরিচ্ছন্ন জ্বালানিতে অর্থায়ন—এসবই হলো এমন সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ যা বর্তমান মডেলের অবাধে নিজেকে পুনরুৎপাদন করার ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে কমিয়ে আনে।

জনগণের এই চাপকে আইন প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক চুক্তি, পরামর্শক পরিষদ গঠন এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত পর্যবেক্ষণের স্থায়ী কাঠামো তৈরির মাধ্যমে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। প্রতিটি সংস্কার এমন হতে হবে যেন তা 'অতিরিক্তের যুক্তি' বা লাগামহীনতার দিকে ফিরে যাওয়ার সব পথ বন্ধ করে দেয়; অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক মুনাফার প্রতি সহনশীলতা কমিয়ে সম্পদ, উৎপাদন ও ভোগের ক্ষেত্রে সমষ্টিগত দায়বদ্ধতা বাড়াতে হবে। অতিরিক্ত ভোগ বা অপচয় সীমিত করার বিষয়টিকে কেবল জরুরি অবস্থার ব্যতিক্রম হিসেবে নয়, বরং শাসনব্যবস্থার একটি স্থায়ী নীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বর্তমান মডেলটি আঁকড়ে ধরে রাখার অর্থ হলো—ক্রমশ ঘনঘন ঘটতে থাকা, তীব্র ও ধ্বংসাত্মক সংকটগুলোকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে মেনে নেওয়া। মানবজাতির ভবিষ্যৎ কেবল আমরা কী উৎপাদন করতে সক্ষম তার ওপর নির্ভর করে না, বরং সর্বোপরি নির্ভর করে আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে আমরা কী কী বিষয় সীমিত বা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম, তার ওপর। অবিরাম সম্প্রসারণের চাপ কমিয়ে অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সংকটের পুনরাবৃত্তি হ্রাস করা, প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি করা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত ভিত্তি রক্ষা করা সম্ভব। যেসব সমাজ জীবনযাত্রার মান, জনস্বাস্থ্য ও টেকসই ব্যবস্থার দিকে নিজেদের আকাঙ্ক্ষাকে ধাবিত করে, তারা অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং এমন অর্থনীতি গঠন করে যা কাঠামোগত ধসের ঝুঁকির মুখে কম অরক্ষিত থাকে। অতিরিক্ত ভোগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা কোনো মডেল আঁকড়ে ধরে রাখার অর্থ হলো বিদ্যমান সংকটগুলোকে আরও গভীর করে তোলা। ভবিষ্যতের স্বরূপ কেবল মানবজাতি কী উৎপাদন করতে সক্ষম, তার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হতে পারে না; বরং নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তারা কীসের ওপর নিয়ন্ত্রণ বা সীমাবদ্ধতা আরোপ করতে সক্ষম হবে, তার ওপরই তা নির্ভর করে।

৪. অসীম চাহিদা ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা

একটি সসীম গ্রহ কীভাবে এমন সব আকাঙ্ক্ষা বা চাহিদাকে টিকিয়ে রাখতে পারে যার কোনো সীমা নেই বলে মনে হয়? অসীম চাহিদা এবং সীমিত সম্পদের মধ্যকার এই টানাপড়েনই আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর মূলে রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ভোগের তীব্রতা এবং বস্তুগত প্রত্যাশা বেড়ে চলার সাথে সাথে এটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে

উঠছে যে—প্রাকৃতিক, জ্বালানি ও উৎপাদনশীল সম্পদের সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই ভারসাম্যহীনতা কেবল অর্থনৈতিক বিষয় নয়; এটি সামাজিক ও পরিবেশগত জীবনের ভবিষ্যৎকেও নির্ধারণ করে।

কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, পানি-ভূমি-জ্বালানি সম্পদের ওপর চাপ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সর্বজনীন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার ক্রমবর্ধমান জটিলতার মধ্য দিয়ে এই সমস্যাটি প্রকাশ পায়। খাদ্যাভাব পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়, সবচেয়ে অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যের প্রাপ্যতা সীমিত করে এবং সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। জ্বালানি সম্পদের ওপর চাপ পরিবহন, উৎপাদন ও অবকাঠামো ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে; অন্যদিকে পরিবেশের অবক্ষয় প্রাকৃতিক ব্যবস্থার নিজস্ব পুনরুৎপাদন ক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সহজ কথায়, এর প্রভাব প্রাত্যহিক জীবন থেকে শুরু করে বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা পর্যন্ত বিস্তৃত।

বর্তমান মডেলটি একটি গভীর এবং সম্ভবত অ-টেকসই কাঠামোগত অসঙ্গতি তৈরি করেছে: এটি এমন এক ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যেখানে ভোগ বা ব্যবহার অনির্দিষ্টকাল ধরে বাড়তে পারে—অথচ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত ভিত্তিটি অনিবার্যভাবেই সসীম। এই অসঙ্গতির মূল কারণ হলো এমন এক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা যা চাহিদার ক্রমাগত বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে, ভোগকে সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করে এবং গ্রহের বাস্তব সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা না করেই নিরন্তর প্রবৃদ্ধির ধারণাকে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ভূমি, পানি, জ্বালানি, খনিজ সম্পদ, উর্বর মাটি এবং জীববৈচিত্র্যকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যেন এগুলোর কোনো শেষ নেই।

বর্তমান সংকট প্রাত্যহিক জীবনের ওপর নির্মম প্রভাব ফেলছে। খাদ্যের উচ্চমূল্য, জ্বালানির ক্রমবর্ধমান খরচ, বিশুদ্ধ পানির অভাব, আবাসন পরিস্থিতির অবনতি এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সংগ্রহের সংগ্রাম—এসবের মাধ্যমেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই বস্তুগত বৈষম্যের মাশুল মূলত সবচেয়ে অসহায় জনগোষ্ঠীকেই দিতে হয়; তারাই সম্পদের অভাব বা ঘাটতির প্রভাব সবার আগে এবং সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভব করে। সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীগুলো যেখানে সঞ্চিত পুঁজির মাধ্যমে নিজেদের রক্ষা করতে সক্ষম হয়, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে অভাবের কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়—যেমন ক্ষুধা, রেশনিং ব্যবস্থা, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি এবং জীবনযাত্রার মানের অবনতি। ভূমি,

পানি ও জ্বালানি সম্পদ নিয়ে সংঘাত প্রত্যক্ষ মানবিক দুর্ভোগ, ব্যাপক অসুস্থতা এবং প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতির প্রভাবে যখন চাহিদা ক্রমাগত স্ফীত হতে থাকে, তখন সম্পদের অভাব আর কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনা থাকে না, বরং তা সামাজিক বাস্তবতার একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়। এই ব্যবস্থা নিজের সম্প্রসারণ বজায় রাখার জন্য অন্তহীন আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে, অথচ একই সাথে দ্রুত সেই বস্তুগত ভিত্তিকেই নিঃশেষ করে ফেলে যা এই ব্যবস্থাকে সম্ভব করে তোলে। মূল বৈপরীত্যটি হলো—সুনির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতাযুক্ত এক পৃথিবীতে অসীম চাহিদার ধারণা তৈরি করা হচ্ছে। আত্মপরিচয়, মর্যাদা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যম হিসেবে ভোগ বা উপভোককে যত বেশি উৎসাহিত করা হয়, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর তত বেশি চাপ পড়ে—অথচ এসব সম্পদের পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীর কিংবা অনেক ক্ষেত্রে তা অসম্ভব।

সম্পদের যৌক্তিক ব্যবস্থাপনা এবং 'চাহিদা'র ধারণাকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন কর্মপদ্ধতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। মানুষের প্রকৃত প্রয়োজন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট চাহিদার মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয়ের মাধ্যমেই এই রূপান্তর প্রক্রিয়া শুরু হতে হবে। এর প্রথম ধাপ হলো খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, জ্বালানি, যাতায়াত ও শিক্ষার মতো মৌলিক ও সমষ্টিগত অগ্রাধিকারগুলোকে চিহ্নিত করা এবং এই ভিত্তিগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে উৎপাদন ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করা। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে এর জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ সরকারি সম্পদ-পরিকল্পনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা সরবরাহ, চাহিদা, কৌশলগত মজুত এবং পরিবেশের পুনরুৎপাদন সক্ষমতা—এসবের ওপর নজর রাখতে সক্ষম হবে। প্রস্তাবিত এই মডেলটি সম্পদ বণ্টনের দক্ষতা, টেকসই উদ্ভাবন এবং সচেতন ভোগ-অভ্যাসের নীতি দ্বারা পরিচালিত। বাস্তবে এর অর্থ হলো—পরিবেশের ওপর কম প্রভাব ফেলে এমন প্রযুক্তি, উপকরণের পুনর্ব্যবহার, বৃত্তাকার অর্থনীতি (circular economy), নবায়নযোগ্য শক্তি এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে অপচয় রোধকারী সরকারি নীতিমালার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা। একই সঙ্গে, এমন সব অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যা অত্যধিক ভোগ, অকালে পণ্য বর্জন এবং দুষ্প্রাপ্য সম্পদের নির্বিচার ও শোষণমূলক ব্যবহারকে উৎসাহিত করে।

এই পরিবর্তনটি অনিবার্যভাবেই এমন সব অর্থনৈতিক খাতের প্রতিরোধের মুখে পড়ে যাদের মুনাফা ক্রমবর্ধমান ভোগ এবং চাহিদার কৃত্রিম প্রসারের ওপর নির্ভরশীল; আর এই বিরোধিতা কেবল উৎপাদন খাতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি সংস্কৃতি, বিজ্ঞাপন এবং রাজনীতির ক্ষেত্রেও এমন সব কাঠামোর মাধ্যমে প্রকাশ পায় যা মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে স্থায়ী প্রয়োজনে রূপান্তর করে এবং নিরন্তর ভোগকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। বৃহৎ উৎপাদন ব্যবস্থা, পরিকল্পিতভাবে পণ্যের আয়ুষ্কাল কমিয়ে ফেলার (planned obsolescence) ওপর নির্ভরশীল খাত, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ফটকা বাজার এবং কৃত্রিমভাবে সংকট সৃষ্টি করে মুনাফা অর্জনকারী গোষ্ঠীগুলো—এরা যেকোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণমূলক প্রচেষ্টাকে প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও পছন্দের স্বাধীনতার জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরে। বর্তমান ব্যবস্থা এই ধারণাটিকেই জিইয়ে রাখতে চায় যে, অধিক ভোগ মানেই অগ্রগতি; অথচ এই প্রক্রিয়াটিই বস্তুগত সম্পদের নিঃশেষকরণ এবং সামাজিক বৈষম্যকে আরও গভীর করে তোলে।

প্রথম পদক্ষেপটি হলো চাহিদার কৃত্রিম ধরন এবং নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসের ঘাটতি বেড়ে যাওয়ার মধ্যকার প্রত্যক্ষ সম্পর্কটি সাধারণ মানুষের সামনে স্পষ্ট করে তোলা। জনগণ যখন বুঝতে পারবে যে খাদ্য, জ্বালানি, আবাসন ও পানির ক্রমবর্ধমান খরচের কারণ কোনো দুর্ভাগ্য নয়, বরং এমন একটি অর্থনৈতিক মডেল যা অতিরিক্ত ভোগ, অপচয় ও সম্পদের কেন্দ্রীভবনকে উৎসাহিত করে—তখন এই রূপান্তরকে আর কেবল তাত্ত্বিক বিষয় মনে হবে না, বরং তা সমষ্টিগত টিকে থাকার জন্য একটি বাস্তব ও জরুরি প্রয়োজন হয়ে উঠবে। এরপর, নিত্যপ্রয়োজনীয় সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল সংস্কার বাস্তবায়ন করতে হবে। এর অর্থ হলো—ব্যাপক অপচয় রোধের ব্যবস্থা করা, টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা, বাধ্যতামূলক পুনর্ব্যবহারের (recycling) লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানো এবং চাহিদার কৃত্রিম প্রসার নিষিদ্ধকারী আইনি কাঠামো গড়ে তোলা। বৃত্তাকার অর্থনীতি (circular economy) বিষয়ক নীতি, অতিরিক্ত অপচয়ের ওপর কর আরোপ, পরিবেশের ওপর কম প্রভাব ফেলে এমন প্রযুক্তির জন্য প্রণোদনা এবং কৌশলগত সম্পদ-ভাণ্ডার সুরক্ষা—এসব পদক্ষেপই ধীরে ধীরে এই সম্প্রসারণবাদী মডেলের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনে।

এরপর অত্যন্ত জরুরি হলো সামাজিক সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে একটি আদর্শগত বা নীতিগত সংখ্যাগরিষ্ঠতায় (normative majority) রূপান্তর করা। জনচাপের ফলে স্থানীয়

সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠন, কঠোর পরিবেশ ও উৎপাদন আইন প্রণয়ন, দীর্ঘমেয়াদী সরকারি পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সরবরাহ শৃঙ্খলের পূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিতকারী ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে। মূল কৌশলটি হলো—আর্থিক মুনাফা ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার হাতিয়ার হিসেবে 'সংকট'-এর ব্যবহার বন্ধ করা। বর্তমান মডেলটি চালিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো এটি মেনে নেওয়া যে, মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের অতিরিক্ত ভোগবিলাস বজায় রাখার স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের জন্য সংকট একটি স্থায়ী অবস্থায় পরিণত হবে।

ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে আমাদের এই বিষয়টি অনুধাবন করার ক্ষমতার ওপর যে, কোনো সমাজই তার অস্তিত্বের ভৌত সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে সমৃদ্ধ হতে পারে না। সম্পদের বিচক্ষণ ব্যবস্থাপনা অপচয় কমায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রাপ্যতা বাড়ায় এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা সুদৃঢ় করে। পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি ও বৃত্তাকার উৎপাদন মডেলের সংযোজন পরিবেশের ওপর চাপ কমায় এবং ভবিষ্যতের যেকোনো সংকটের মুখে সমাজের টিকে থাকার সক্ষমতা বা সহনশীলতা বৃদ্ধি করে। অফুরন্ত চাহিদা এবং সীমিত সম্পদের মধ্যকার সংঘাত মানবজাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত টিকে থাকার ক্ষেত্রে একটি কেন্দ্রীয় বিষয়। বর্তমান মডেলটি বজায় রাখার অর্থ হলো সংকটকে আরও ঘনীভূত করা। ভবিষ্যতের জন্য যেকোনো বলিষ্ঠ উদ্যোগের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আরোপ এবং অগ্রাধিকার পুনর্বিন্যাস করা এখন এক জরুরি আবশ্যকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৫. সংবাদমাধ্যম – সত্য ও মিথ্যা

এমন এক বিশ্বে—যেখানে তথ্য যাচাই করার ক্ষমতার চেয়েও দ্রুতগতিতে তা ছড়িয়ে পড়ে—সেখানে কীভাবে আমরা সত্য ও কারসাজির মধ্যে পার্থক্য করব? এটি সমসাময়িক জীবনের একটি কেন্দ্রীয় বিষয়; কারণ তথ্য কেবল বাস্তবতাকে তুলে ধরে না, বরং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্তকেও প্রভাবিত করে। ডিজিটাল গতির এই যুগে, সত্য ও ভুল তথ্যের মধ্যকার সংঘাত আর কোনো প্রান্তিক বিষয় নয়, বরং তা জন-আলোচনার মান নির্ধারণকারী একটি প্রধান উপাদানে পরিণত হয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে জনমত গঠনে সংবাদমাধ্যম বা গণমাধ্যম নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। নিরাপত্তা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ও শাসনব্যবস্থা বিষয়ক সংবাদ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে এবং ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করে দৈনন্দিন আচরণ—

সবকিছুকেই প্রভাবিত করে। একই সঙ্গে, সোশ্যাল মিডিয়া ও তাৎক্ষণিক বার্তা আদান-প্রদানের প্ল্যাটফর্মগুলোর ব্যাপক বিস্তারের ফলে যাচাই-বাছাইহীন তথ্যের প্রসার ঘটেছে; এর ফলে মিথ্যা তথ্য মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে লাখ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে।

বর্তমান ব্যবস্থার সমস্যাটি মূলত তথ্যের দ্রুত বিস্তার, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতার অভাব—এই বিষয়গুলোর সংমিশ্রণ থেকে উদ্‌ভূত। জনজীবনে স্বচ্ছতা ও যৌক্তিক দিকনির্দেশনার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করার কথা যে তথ্যের, তা এখন তাৎক্ষণিক প্রভাব, দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা এবং এনগেজমেন্ট বা সম্পৃক্ততার (লাইক-শেয়ার-কমেন্ট) যুক্তির কাছে বন্দী হয়ে পড়েছে। এর মূল কারণ হলো ব্যাপক প্রচার, প্রভাব বিস্তার ও অর্থ উপার্জনের নিরন্তর চাপ; যা প্রায়শই নির্ভুলতা ও জন-জবাবদিহিতার চেয়ে তথ্যের দ্রুত প্রচারকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। এর ফলে অসম্পূর্ণ, বিকৃত বা ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি মিথ্যা তথ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। যখন সত্য গৌণ হয়ে পড়ে, তখন যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সমাজের সক্ষমতা ব্যাহত হয়। এই প্রেক্ষাপটে, মিথ্যা তথ্য কেবল একটি ভুল বা ত্রুটি হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির একটি শক্তিশালী ও বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়। এটি নির্বাচনী প্রক্রিয়া, অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত, জনস্বাস্থ্য নীতি এবং নিরাপত্তা, বিজ্ঞান ও ন্যায়বিচার বিষয়ক ধারণাকে প্রভাবিত ও ব্যাহত করে। এই ভুল তথ্যের মাশুল গুনতে হয় সাধারণ মানুষকে—যেমন ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে চিকিৎসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া পরিবার, কারসাজি করা বয়ানের প্রভাবে ভোট দেওয়া নাগরিক এবং ভয়, ঘৃণা বা সামাজিক কলঙ্কের শিকার হওয়া বিভিন্ন জনগোষ্ঠী। চরম পরিস্থিতিতে ভুল তথ্যের কারণে প্রাণহানিও ঘটতে পারে—তা সামাজিক আতঙ্ক, চিকিৎসা গ্রহণে অস্বীকৃতি, সমষ্টিগত সহিংসতা কিংবা অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা হারানোর মাধ্যমেই হোক না কেন। এই ব্যবস্থা থেকে যারা লাভবান হয় তারা হলো—মানুষের মনোযোগকে পুঁজি করে অর্থ উপার্জনকারী অর্থনৈতিক গোষ্ঠী, কৌশলগতভাবে ভুল তথ্য ছড়িয়ে সুবিধাভোগী রাজনৈতিক শক্তি এবং এমন সব ক্ষমতার কাঠামো যারা কোনো বয়ান বা আখ্যানকে নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। যখন তথ্যকে জনকল্যাণমূলক বিষয় হিসেবে না দেখে কেবল প্রভাব বিস্তারকারী পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তখন একটি 'অংশীদারিত্বমূলক বাস্তবতা' বা সবার জন্য অভিন্ন সত্যের ধারণাই খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে। স্বচ্ছতা, কঠোর যাচাইকরণ এবং সমালোচনামূলক গণমাধ্যম সাক্ষরতার উপর ভিত্তি করে একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। এই রূপান্তরের প্রথম ধাপে স্বাধীন তথ্য-যাচাই ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ অন্তর্ভুক্ত,

যার কাঠামো স্বচ্ছ নিরীক্ষা এবং সুস্পষ্ট পদ্ধতিগত মানদণ্ডের অধীন থাকবে। একই সাথে, গণমাধ্যমগুলোকে বৃহত্তর সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে, যার জন্য সংশোধন, উৎসের সন্ধানযোগ্যতা এবং তথ্য, মতামত ও পৃষ্ঠপোষকতাকৃত বিষয়বস্তুর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যের জন্য বাধ্যতামূলক প্রোটোকল থাকতে হবে।

কাঠামোগত স্তরে, এই প্রস্তাবে স্কুলশিক্ষার একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই গণমাধ্যম সাক্ষরতার প্রসারের আহ্বান জানানো হয়েছে। এর অর্থ হলো, শৈশব থেকেই ব্যক্তিদের উৎস মূল্যায়ন করতে, আখ্যানের স্বার্থ শনাক্ত করতে, প্রমাণ যাচাই করতে এবং তথ্য কারসাজির কৌশলগুলো বিস্তারিতভাবে বুঝতে সক্ষম করে তোলা। শিক্ষাক্রমে অবশ্যই সমালোচনামূলক গণমাধ্যম সাক্ষরতা, তথ্য ব্যাখ্যা, যুক্তিমূলক যুক্তি এবং উৎসের বিশ্বাসযোগ্যতা বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গণমাধ্যমকে বিষয়বস্তুর দ্রুত প্রচারের একটি ব্যবস্থা হিসেবে না দেখে, সম্মিলিত জ্ঞানার্জনের একটি মাধ্যম হিসেবে পুনঃস্থাপন করতে হবে।

যেকোনো নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন অনিবার্যভাবেই এমন সব মহলের বাধার মুখে পড়ে যাদের মুনাফা নির্ভর করে চাঞ্চল্য সৃষ্টি, মেরুকরণ এবং যেকোনো মূল্যে মনোযোগ আকর্ষণের ওপর; আর এই বাধা অত্যন্ত কৌশলী ও বিস্তৃতভাবে কাজ করে। যেসব প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারকারীদের সম্পৃক্ততা বা 'এনগেজমেন্ট' থেকে অর্থ উপার্জন করে, যেসব রাজনৈতিক গোষ্ঠী পরিকল্পিত অপপ্রচারের ওপর টিকে থাকে, যেসব গণমাধ্যম কেবল দর্শক বা পাঠক সংখ্যার ওপর গুরুত্ব দেয় এবং যেসব অর্থনৈতিক কাঠামো চাঞ্চল্যকর বয়ানের ওপর নির্ভরশীল—তারা সবাই তথ্যের কোলাহল বা বিভ্রান্তি বাড়িয়ে বর্তমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায়। তাদের কৌশল হলো তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করা, সত্যের ধারণাকে আপেক্ষিক করে তোলা এবং স্থায়ী সংশয়কে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারে পরিণত করা। অনেক ক্ষেত্রেই মিথ্যা সরাসরি মিথ্যা হিসেবে হাজির হয় না; বরং তা আংশিক বিকৃতি, প্রসঙ্গের খণ্ডন এবং আবেগ-উদ্বেলকারী বয়ানের সুপরিকল্পিত ও বারবার প্রচারের মাধ্যমে সামনে আসে।

দ্বিতীয় ধাপটি সম্পন্ন হতে হবে যোগাযোগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ভেতরে। এর অর্থ হলো—সম্পাদকীয় স্বচ্ছতা, স্বাধীন তথ্য-যাচাই ব্যবস্থা, তথ্যের উৎসের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা এবং গণমাধ্যম ও প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য ভুল সংশোধনের স্পষ্ট বাধ্যবাধকতা বা নিয়ম চালু করা। বিষয়বস্তুর ধরন চিহ্নিত করা (লেবেলিং), অ্যালগরিদম নিরীক্ষা,

সংবাদ-মতামত-বিজ্ঞাপনের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখা এবং ইচ্ছাকৃত অপপ্রচারের জন্য আনুপাতিক শাস্তির ব্যবস্থা করা—এসব পদক্ষেপ পদ্ধতিগত কারসাজির সুযোগ কমিয়ে আনে। জনমতের চাপকে স্থায়ী শিক্ষানীতি, স্বাধীন নৈতিকতা বিষয়ক পরিষদ, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের স্বচ্ছ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং জন-জবাবদিহিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সংবাদমাধ্যমের শক্তিশালীকরণের প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করা প্রয়োজন। প্রতিটি নতুন পদক্ষেপের লক্ষ্য হওয়া উচিত মনোযোগ আকর্ষণকেই মূল মানদণ্ড হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা কমানো এবং সত্যনিষ্ঠার প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গীকারকে আরও বিস্তৃত করা। তথ্যের ওপর আস্থাকে গণতন্ত্রের একটি স্থায়ী কাঠামোয় পরিণত করাই হওয়া উচিত আমাদের লক্ষ্য।

তথ্যের ওপর আস্থা না থাকলে কোনো যৌক্তিক আলোচনা সম্ভব নয়। সত্যের প্রতি অঙ্গীকার ছাড়া কার্যকর গণতন্ত্র বা টেকসই যৌথ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা যায় না। সংবাদমাধ্যমের সততা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করা মানেই হলো এমন একটি সমাজের সম্ভাবনাকে রক্ষা করা, যা বাস্তবতার নিরিখে চিন্তা করতে, সিদ্ধান্ত নিতে ও পদক্ষেপ নিতে সক্ষম। তথ্য যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর কঠোরতা এবং জনগণের মধ্যে সমালোচনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের সক্ষমতা থাকলে ভুল তথ্যের বিস্তার কমে, প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা বাড়ে এবং জন-আলোচনার মান উন্নত হয়। সু-তথ্যপ্রাপ্ত সমাজ কারসাজির শিকার হওয়ার ঝুঁকি কমায় এবং গ্রহণযোগ্য ঐকমত্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অধিকতর সক্ষম হয়ে ওঠে। দায়িত্বশীল সংবাদমাধ্যম ও তথ্য-বিশ্লেষণে সচেতন সংস্কৃতি রক্ষা করা এখন আর কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক পছন্দের বিষয় নয়, বরং সামাজিক যৌক্তিকতা রক্ষার জন্য এটি একটি জরুরি প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬. রক্তের সম্পর্ক বনাম ভালোবাসার বন্ধন

একটি পরিবারকে আসলে কী টিকিয়ে রাখে: জৈবিক উত্তরাধিকার নাকি আবেগপূর্ণ উপস্থিতি? এই বিষয়টি সামাজিক সংগঠনের অন্যতম প্রাচীন কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানায়; এটি প্রশ্ন তোলে যে, পারিবারিক বন্ধন কি মূলত বংশগতির দ্বারা সংজ্ঞায়িত হওয়া উচিত, নাকি যত্ন, দায়িত্ববোধ এবং আপন করে নেওয়ার অনুভূতির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা দৈনন্দিন সম্পর্কের দ্বারা? পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে, মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থানের নতুন রূপগুলো বোঝার ক্ষেত্রে এই ভাবনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আজকাল পারিবারিক কাঠামো আর কেবল রক্তের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা প্রথাগত মডেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দত্তক গ্রহণ, সামাজিক-আবেগীয় বন্ধন, সৎ বাবা-মা, ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সম্প্রদায়ের সহায়তা ব্যবস্থার মাধ্যমে গড়ে ওঠা পরিবারগুলো প্রমাণ করে যে, জৈবিক উৎসের চেয়ে ভালোবাসার অভিজ্ঞতার প্রভাব অনেক গভীর। দৈনন্দিন জীবনেও এই বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট: একজন ব্যক্তির মানসিক সমর্থন, শিক্ষা, নিরাপত্তা এবং নিজস্ব সত্তা বা পরিচয় গড়ে ওঠে তাদের দ্বারা যারা বাস্তবে পাশে থাকে—শুধুমাত্র তাদের দ্বারা নয় যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে।

প্রথাগত মডেলটি যখন কঠোরভাবে কেবল জৈবিক উত্তরাধিকারের ওপর কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তখন তাতে গভীর সীমাবদ্ধতা দেখা দেয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তা মানবিক দিক থেকে বেদনাদায়ক হয়ে ওঠে। এর মূল কারণ হলো—পারিবারিক বৈধতা, আপনজন হওয়ার অনুভূতি এবং সামাজিক স্বীকৃতির মাপকাঠি হিসেবে রক্তের সম্পর্ককে প্রায় একক গুরুত্ব দেওয়া। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে জৈবিক বন্ধনকে পরম সত্য হিসেবে গণ্য করা হয়, অথচ যত্ন, সহাবস্থান এবং দৈনন্দিন উপস্থিতির মাধ্যমে গড়ে ওঠা সম্পর্কগুলোকে গৌণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এই কাঠামো গভীর মানবিক যন্ত্রণার জন্ম দেয়। ব্যক্তিরা রক্তের সম্পর্কের বাইরেও গ্রহণযোগ্যতা, সুরক্ষা এবং ভালোবাসা খুঁজে পান ঠিকই, কিন্তু সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতির কাছে তারা থেকে যান অদৃশ্য বা উপেক্ষিত। এমন অনেক শিশু আছে যারা দাদা-দাদি/নানা-নানি, চাচা-মামারা, সৎ বাবা-মা, অনানুষ্ঠানিক দত্তক পরিবার বা সম্প্রদায়ের সহায়তা ব্যবস্থার মাধ্যমে বেড়ে ওঠে; তারা পরিবারের ভূমিকা পুরোপুরি পালন করা সত্ত্বেও সমান সামাজিক স্বীকৃতি পায় না। যখন বৈধতার একমাত্র ভিত্তি হিসেবে রক্তকে ধরা হয়, তখন এমন সব কাঠামোর বৈধতা পাওয়ার ঝুঁকি থাকে যা আন্তরিক সমর্থনের চেয়ে আনুষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতার দ্বারা বেশি নিয়ন্ত্রিত।

এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির মাশুল মূলত তাদেরই দিতে হয় যারা প্রথাগত কাঠামোর বাইরে জীবনযাপন করেন: যেমন—অপ্রচলিত পারিবারিক ব্যবস্থায় বেড়ে ওঠা শিশু, আনুষ্ঠানিক সম্পর্কহীন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচর্যাপ্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়াই দৈনন্দিন জীবন টিকিয়ে রাখা দম্পতি বা আবেগীয় বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ। এই যন্ত্রণা নানাভাবে প্রকাশ পায়—অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া, গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে মতামত জানানোর সুযোগ না থাকা, প্রদত্ত সেবার স্বীকৃতি না পাওয়া এবং চরম ক্ষেত্রে মানসিক ও বস্তুগতভাবে পরিত্যক্ত হওয়া। সামাজিক-আবেগীয় বন্ধনগুলোর

অদৃশ্যমানতা কেবল একটি ধারণাগত বিষয় নয়; নিরাপত্তা, আপনত্বের বোধ এবং মানবিক মর্যাদার ওপর এর প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।

মানবিক সম্পর্কের একটি গঠনমূলক উপাদান হিসেবে আমাদের অবশ্যই স্নেহ বা আবেগের গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে। এই পরিবর্তনের প্রথম ধাপটি হলো আইনি ও সামাজিক পর্যায়ে পরিবার ও আপনত্বের ধারণাকে প্রসারিত করা এবং একই সাথে বসবাস, পারস্পরিক যত্ন ও একে অপরের জীবনে উপস্থিত থাকার সচেতন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গড়ে ওঠা বন্ধনগুলোকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করা। প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে এর অর্থ হলো—সন্তানের অভিভাবকত্ব, উত্তরাধিকার, আইনি প্রতিনিধিত্ব, চিকিৎসা-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং একত্রে বসবাসের অধিকার বিষয়ক নিয়মকানুনগুলো পুনর্বিবেচনা করা, যাতে জৈবিক সম্পর্কের মতোই আবেগীয় সম্পর্কের বাস্তবতাও সমান গুরুত্ব পায়। রক্তের সম্পর্কের একচেটিয়া মানদণ্ডের পরিবর্তে আমাদের এমন এক 'সম্পর্কভিত্তিক বৈধতা'র মডেল গ্রহণ করতে হবে, যেখানে প্রকৃত যত্ন, দায়িত্ব গ্রহণ এবং নিরন্তর উপস্থিতিই সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। রক্ত ও ভালোবাসাকে একে অপরের বিপরীত হিসেবে দাঁড় না করিয়ে, এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করে যে—পরিবার মূলত গড়ে ওঠে একে অপরের প্রতি যত্ন ও পরিচর্যার বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এ ক্ষেত্রে, স্নেহ বা আবেগ কেবল একটি আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক জীবনের কাঠামোয় এক কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে নেয়।

এই পরিবর্তনের পথে বাধা আসবে, বিশেষ করে সেইসব সাংস্কৃতিক, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে—যেখানে ঐতিহাসিকভাবে বৈধতাকে জৈবিক উত্তরাধিকার ও প্রথাগত রীতিনীতির সাথে যুক্ত করা হয়েছে। গভীর প্রোথিত সামাজিক প্রথা, আইনের সীমাবদ্ধ ব্যাখ্যা এবং এমন সব ধারণার মধ্য দিয়ে এই বিরোধিতা উঠে আসবে যা কেবল রক্তের সম্পর্ককেই পারিবারিক অন্তর্ভুক্তির একমাত্র বৈধ ভিত্তি হিসেবে তুলে ধরে। এই প্রতিরোধ কেবল তাত্ত্বিক বা ধারণাগত স্তরে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং তা সন্তান বা ব্যক্তির জিম্মাদারি (custody), উত্তরাধিকার, আইনি প্রতিনিধিত্ব, সাক্ষাতের অধিকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির মতো বিষয়গুলোর ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান হবে।

পরিবর্তনের প্রথম ধাপটি অবশ্যই সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আইনি কাঠামোর ভেতরেই সম্পন্ন হতে হবে। এর অর্থ হলো—পরিবার, জিম্মাদারি, উত্তরাধিকার, হাসপাতালে অধিকার, আইনি প্রতিনিধিত্ব এবং শিশু সুরক্ষার সাথে সম্পর্কিত আইনগুলোর ধারাবাহিক

সংশোধন করা। এর ফলে, যেখানেই প্রকৃত যত্ন ও দায়িত্ববোধের উপস্থিতি থাকবে, সেখানেই জৈবিক সম্পর্কের পাশাপাশি 'সামাজিক-আবেগীয়' (socio-affective) বন্ধনও সমান স্বীকৃতি পাবে। আবেগ-ভিত্তিক পরিবারের আইনি স্বীকৃতি, সাক্ষাতের অধিকারের প্রসার, জৈবিক সম্পর্কহীন পরিচর্যাকারীদের সুরক্ষা এবং বর্ধিত পারিবারিক কাঠামোর প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি বর্তমান মডেলের কঠোরতা বা অনমনীয়তা কমিয়ে আনে। শিশু সুরক্ষা, দত্তক গ্রহণে সহায়তা, পারিবারিক সহায়তা এবং পারিবারিক সম্পর্কের নানাবিধ রূপের আইনি স্বীকৃতির ক্ষেত্রে জনমত ও চাপকে সরকারি নীতিমালায় রূপান্তর করা প্রয়োজন। প্রতিটি নতুন অগ্রগতির মাধ্যমে এমন পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে হবে যেখানে কেবল উৎপত্তির আনুষ্ঠানিকতার ভিত্তিতে অন্তঃসারশূন্য বা নামমাত্র বন্ধনগুলো বিশেষ সুবিধা বা অগ্রাধিকার পায়।

যে সমাজ কেবল উৎপত্তির বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু প্রকৃত যত্ন বা পরিচর্যাকে উপেক্ষা করে, সেখানে অন্তঃসারশূন্য বন্ধনগুলো বৈধতা পাওয়ার এবং যারা প্রকৃতপক্ষে অন্যের জীবন ধারণে সহায়তা করেন তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে। আবেগীয় বন্ধনকে বৈধ সম্পর্ক হিসেবে স্বীকৃতি দিলে সামাজিক সুরক্ষার পরিধি বাড়ে, ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য শক্তিশালী হয় এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর পারিবারিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়। প্রথাগত কাঠামোর বাইরে বা প্রান্তিক অবস্থানে থাকা মানুষরা স্বীকৃতি, স্থিতিশীলতা ও আপনজন হিসেবে অন্তর্ভুক্তির অনুভূতি লাভ করেন, যা তাঁদের মানসিক ও সামাজিক দুর্বলতা বা ঝুঁকি কমিয়ে আনে।

এই বিতর্কটি কেবল ব্যক্তিগত গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা 'সম্প্রদায়' বা 'সমাজ'-এর মূল ধারণাকেও স্পর্শ করে। যে সমাজ মানবিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে স্নেহের মূল্যকে স্বীকৃতি দেয়, সেই সমাজ আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহনশীল হয়ে ওঠে এবং মানুষের প্রকৃত চাহিদার আরও কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। সামাজিক কাঠামোর ভবিষ্যৎ যেন জৈবিক উৎপত্তির ওপর কম এবং প্রকৃত, দীর্ঘস্থায়ী ও মানবিক বন্ধন গড়ে তোলার সক্ষমতার ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়—সেটাই কাম্য।

৭. বৈশ্বিক জাতিসত্তা – সীমানাবিহীন এক বিশ্ব

আমরা কীভাবে মহাদেশ-জুড়ে বিস্তৃত সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করব, যদি আমরা এখনও বিশ্বকে কেবল রাজনৈতিক সীমানার গণ্ডিতেই বিবেচনা করি? ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই এই বিষয়টি সামনে এসেছে; এমন এক বাস্তবতা যেখানে জলবায়ু, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য এবং প্রযুক্তির সংকটগুলো কোনো জাতীয় সীমানা মানে না। তথ্য, বাণিজ্য এবং মানুষের অবাধ চলাচলের মাধ্যমে সংযুক্ত এই বিশ্বে, বিচ্ছিন্ন জাতিসত্তার ওপর জোর দেওয়াটা বর্তমানের জটিল পরিস্থিতির সাথে ক্রমশ অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে পড়েছে। সমাজগুলো এখন আন্তর্জাতিক উৎপাদন-শৃঙ্খল, তাৎক্ষণিক ডিজিটাল নেটওয়ার্ক এবং বৈশ্বিক মাত্রার অভিন্ন চ্যালেঞ্জের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যুক্ত। কোনো একটি দেশের আর্থিক সংকট বিশ্ববাজারকে প্রভাবিত করে। কোনো আঞ্চলিক সংঘাত বিভিন্ন মহাদেশে জ্বালানি ও খাদ্যের দাম বদলে দেয়। একটি মহামারি দ্রুত বৈশ্বিক সমস্যায় রূপ নেয়। স্থানীয় সিদ্ধান্তগুলোই এখন বৈশ্বিক প্রভাব ফেলছে এবং কাঠামোগত চ্যালেঞ্জের মুখে বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপগুলো অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হচ্ছে।

এর মূল কারণ হলো বৈশ্বিক সমষ্টিগত প্রয়োজনের চেয়ে তাৎক্ষণিক জাতীয় স্বার্থের প্রাধান্য। রাষ্ট্র, সরকার এবং অর্থনৈতিক জোটগুলো প্রতিযোগিতামূলক আত্মরক্ষার নীতিতেই কাজ করে চলেছে; তারা স্বল্পমেয়াদী অভ্যন্তরীণ লাভকে অগ্রাধিকার দেয়, এমনকি যখন তাদের সম্মুখস্থ চ্যালেঞ্জগুলো ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে যায় তখনও। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন প্রবাহ, বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, জনস্বাস্থ্য এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সহযোগিতার ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী জটিলতা সৃষ্টি হয়।

বৈশ্বিক সমস্যার মুখে যখন প্রতিটি জাতি বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে, তখন তার ফল হয় অদক্ষতা, স্বার্থের সংঘাত এবং কাঠামোগত সমাধান বাস্তবায়নে বিলম্ব। এই সমন্বয়ের অভাবের মাশুল দিতে হয় চরম আবহাওয়ার শিকার জনগোষ্ঠী, শরণার্থী ও জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মানুষ, আন্তঃসীমান্ত স্বাস্থ্য সংকটে আক্রান্ত সম্প্রদায় এবং অর্থনৈতিকভাবে

দুর্বল দেশগুলোকে—যারা প্রধান ক্ষমতার কেন্দ্রগুলোর নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রভাবের কারণে অসমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ভোগান্তি খাদ্য সংকট, পরিবারগুলোর ব্যাপক বাস্তুচ্যুতি, দারিদ্র্য বৃদ্ধি এবং এমন সব প্রাণহানির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়—যা দ্রুত ও সমন্বিত বৈশ্বিক পদক্ষেপের মাধ্যমে বাঁচানো সম্ভব ছিল।

জলবায়ু সংকট সম্ভবত এই বৈপরীত্যের সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ। কোনো এক অঞ্চলে দূষক নির্গমন বিশ্বজুড়ে বাস্তুতন্ত্র, অর্থনীতি এবং জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে। একটি স্থানীয় স্বাস্থ্য সংকট দ্রুত বৈশ্বিক হুমকিতে পরিণত হতে পারে। অথচ, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া রয়ে গেছে খণ্ডিত; যা ভূ-রাজনৈতিক বিরোধ, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং জাতীয় নির্বাচনী হিসাব-নিকাশ দ্বারা প্রভাবিত। এই বিভাজন বা খণ্ডিত অবস্থার সুযোগ নেয় এমন সব গোষ্ঠী ও কাঠামো, যারা কার্যকর আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধের অভাব, বৈশ্বিক সম্পদের অসম শোষণ এবং কেন্দ্র ও প্রান্তিক দেশগুলোর মধ্যকার বৈষম্য থেকে লাভবান হয়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতামূলক শাসনব্যবস্থা এবং মানব-অংশীদারিত্বের এক বিস্তৃত ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটি নতুন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। 'বৈশ্বিক জাতি' বা বিশ্ব-সম্প্রদায় গঠনের অর্থ সাংস্কৃতিক পরিচিতি, স্থানীয় সার্বভৌমত্ব কিংবা জাতীয় ঐতিহ্যকে বিলুপ্ত করা নয়; বরং এর লক্ষ্য হলো এমন এক স্থায়ী সহযোগিতামূলক কাঠামো গড়ে তোলা—যা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে সীমানা ছাড়িয়ে কাজ করতে সক্ষম এবং যার মাধ্যমে বৈশ্বিক মাত্রার কোনো সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব। এই রূপান্তরের মূল বিষয় হলো জলবায়ু, স্বাস্থ্য, খাদ্যনিরাপত্তা ও প্রযুক্তির মতো কৌশলগত ক্ষেত্রে সমন্বয়, তদারকি ও বাস্তবায়নের প্রকৃত সক্ষমতাসম্পন্ন বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা। এর আওতায় বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্বসহ বৈশ্বিক পরামর্শক পরিষদ গঠন, আন্তর্জাতিক সংকট মোকাবিলায় যৌথ অর্থায়ন ব্যবস্থা, জরুরি পরিস্থিতিতে সাড়া দেওয়ার অভিন্ন কার্যপদ্ধতি এবং টেকসই উন্নয়ন ও সম্পদ ব্যবহারের বিষয়ে বাধ্যতামূলক চুক্তি প্রণয়ন অন্তর্ভুক্ত। প্রস্তাবিত এই মডেলটি মূলত একটি 'নেটওয়ার্ক-ভিত্তিক শাসনব্যবস্থা', যেখানে জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং এমন সব অতি-জাতীয় (supranational) সংস্থার সহাবস্থান ঘটে—যারা মূলত সেসব বিষয় নিয়ে কাজ করে যা কোনো একক দেশের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার আওতা বা সক্ষমতার বাইরে।

এটা প্রত্যাশিত যে এই পরিবর্তনটি প্রতিরোধের মুখে পড়বে—বিশেষ করে সেইসব রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক জোট এবং কৌশলগত গোষ্ঠীর কাছ থেকে যারা নিজেদের প্রভাব হারানো, দায়িত্বের পুনর্বণ্টন কিংবা এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ার আশঙ্কায় থাকে। এই প্রতিরোধ মূলত 'পূর্ণাঙ্গ সার্বভৌমত্ব'-এর যুক্তি, ভূ-রাজনৈতিক বিরোধ, বাছাইকৃত সংরক্ষণবাদ এবং সমষ্টিগত সমাধানের পরিবর্তে তাৎক্ষণিক জাতীয় স্বার্থ রক্ষার দাবির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাবে। সুবিধাজনক অবস্থানে কাজ করতে অভ্যস্ত ক্ষমতার কাঠামোসমূহ জাতীয় সীমানা-অতিক্রমী (supranational) যেকোনো অগ্রগতিকে নিজেদের পরিচিতি, রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন কিংবা অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করবে। ফলে, বিভাজন বা বিচ্ছিন্নতাকে বিচক্ষণতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে, যখন আসলে তা বিশ্ব-কেন্দ্র ও প্রান্তিক অঞ্চলগুলোর মধ্যকার ঐতিহাসিক অসমতা বজায় রাখার একটি কৌশল হিসেবে কাজ করে।

তাই, এই পরিবর্তন কোনো আকস্মিক বিচ্ছেদের ওপর নির্ভর করতে পারে না; বরং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরিসরে একটি ধীরস্থির, দৃঢ় এবং বৈধ প্রবেশের মাধ্যমেই তা সম্ভব। আমাদের এমন একটি ব্যাপক সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে যা বোঝাবে যে, বর্তমান সময়ের প্রধান ঝুঁকিগুলো—যেমন জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা, জোরপূর্বক অভিবাসন, স্বাস্থ্য সংকট, জ্বালানি ও আর্থিক স্থিতিশীলতা—ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করছে। যখন সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করবে যে স্থানীয় সমস্যাগুলোর পেছনে বৈশ্বিক কারণ ও প্রভাব রয়েছে, তখন সীমানা-অতিক্রমী সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোর প্রয়োজনীয়তাকে রাজনৈতিকভাবে সমর্থন করা সম্ভব হবে। তখন বিদ্যমান বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা এবং নতুন নতুন বিষয়ভিত্তিক শাসন-কাঠামো বা ফোরাম গড়ে তোলা জরুরি হয়ে পড়বে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রের মাধ্যমে শুরু হওয়া উচিত: বৈশ্বিক স্বাস্থ্য, জলবায়ু, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা। বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক প্রটোকল, সহযোগিতামূলক জরুরি তহবিল, আঞ্চলিক দ্রুত-সাড়া প্রদানকারী পরিষদ এবং নিরীক্ষাযোগ্য যৌথ লক্ষ্যমাত্রা—এসবই হলো এমন কিছু বাস্তব উদাহরণ যা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বাড়ায় এবং জনগণের কাছে এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

জনগণের ও কূটনৈতিক চাপকে এমন সব বৈশ্বিক পরিষদে রূপান্তর করতে হবে যেখানে থাকবে ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিনিধিত্ব, সংহতি-ভিত্তিক অর্থায়নের স্বচ্ছ প্রক্রিয়া এবং আন্তঃসীমান্ত সংকটের মোকাবিলায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের সক্ষমতা। প্রতিটি নতুন চুক্তির লক্ষ্য হওয়া উচিত বিচ্ছিন্ন পদক্ষেপের সুযোগ কমিয়ে আনা এবং সমষ্টিগত যৌথ-দায়িত্ববোধের ধারণাকে শক্তিশালী করা। এর উদ্দেশ্য হলো আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে ক্রমবিকাশমান করে তোলা: পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিটি সংকটের সমাধান পরবর্তী প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তাকে আরও জোরালো করে তুলবে।

মানবজাতি ইতিমধ্যেই ঝুঁকি, সম্পদ এবং অভিন্ন ভাগ্যের অংশীদার। যার অভাব রয়েছে তা হলো এমন সব প্রতিষ্ঠানের গঠন, যারা বিশ্বব্যাপী পরিসরে চিন্তা করতে ও কাজ করতে সক্ষম। বৈশ্বিক সংকটের মোকাবিলায় বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত প্রচেষ্টায় অটল থাকার অর্থ হলো এড়ানো সম্ভব এমন দুর্ভোগকে দীর্ঘায়িত করা এবং সমষ্টিগত অস্তিত্বকে ঝুঁকির মুখে ফেলা। বৈশ্বিক সহযোগিতার নীতি স্বাস্থ্য, জলবায়ু ও অর্থনৈতিক সংকটের ক্ষেত্রে দ্রুত সাড়া প্রদানের বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আদান-প্রদান জোরদার করে এবং পরস্পরবিরোধী জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সৃষ্ট উত্তেজনা হ্রাস করে। সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন সম্পদের সুষম বণ্টনের দক্ষতা বাড়ায়, আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে এবং পৃথিবীর ভবিষ্যতের প্রতি যৌথ দায়বদ্ধতার ধারণাকে শক্তিশালী করে।

একটি 'বৈশ্বিক জাতি'র কথা ভাবার অর্থ হলো এটি স্বীকার করে নেওয়া যে, রাজনৈতিক সীমানা আর মানবজাতির কৌশলগত বুদ্ধিবৃত্তিকে সীমাবদ্ধ করে রাখতে পারে না। বর্তমান শতাব্দী এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি দাবি করে যা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও কাঠামোগত সহযোগিতাকে একসূত্রে বাঁধতে সক্ষম। সর্বজনীন সমস্যাগুলোর মোকাবিলায় বিচ্ছিন্ন বা খণ্ডিত প্রচেষ্টায় আটকে থাকার অর্থ হলো অনিবার্য সংকটগুলোকে দীর্ঘায়িত করা। তাই বৈশ্বিক চেতনার দিকে অগ্রসর হওয়া কেবল কাম্যই নয়, বরং ঐতিহাসিকভাবে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

৮. প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে যৌথ অগ্রগতির পথে

অগ্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচিত প্রতিযোগিতা ঠিক কতটা উন্নয়নের চাকা সচল রাখার বদলে সমাজকে খণ্ডিত করতে শুরু করেছে? এটি

সমসাময়িক সংস্কৃতির অন্যতম একটি স্তম্ভ—অর্থাৎ উন্নতির জন্য অন্যদের পরাজিত করা অপরিহার্য—সেই ধারণাটির ওপর একটি গভীর পর্যালোচনা। ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতার এই বিশ্বে এই যুক্তিটি পুনর্বিবেচনা করা জরুরি; বিশেষ করে যখন এর প্রভাব কেবল ব্যক্তিগত গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করতে শুরু করে।

জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা বিদ্যমান: কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা, অর্থনীতি এবং এমনকি পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। একেবারে ছোটবেলা থেকেই মানুষকে এমন সব ব্যবস্থার মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয় যেখানে তুলনামূলক দক্ষতা, সুযোগের সীমাবদ্ধতা এবং অন্যদের চেয়ে নিজেকে আলাদা বা শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার বিষয়গুলোকে পুরস্কৃত করা হয়। এর ফলে সমাজে মানসিক চাপ বাড়ে, পারস্পরিক সহযোগিতা দুর্বল হয়, সুযোগের অসমতা তৈরি হয় এবং এমন এক পরিবেশ গড়ে ওঠে যেখানে একজনের সাফল্য নির্ভর করে অনেককে পেছনে ফেলে বা বাদ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ওপর। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে প্রতিযোগিতাকে যখন পরম বা একমাত্র নীতি হিসেবে দেখা হয়, তখনই এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। এর মূল কারণ হলো ব্যক্তিগত দক্ষতার ওপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ, সম্পদের সীমাবদ্ধতার ধারণা এবং এই বিশ্বাস যে কেবল অন্যদের অতিক্রম করার মাধ্যমেই অগ্রগতি সম্ভব। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে সমষ্টিগত জীবন এক স্থায়ী প্রতিযোগিতার ময়দানে পরিণত হয়: মানুষ কাজ, স্বীকৃতি, সম্পদ, মর্যাদা এবং এমনকি কোনো গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যও একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে। এর চূড়ান্ত ফলাফল হলো এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা যা সহযোগিতামূলক নয় বরং খণ্ডিত এবং কাঠামোগত সংকটের মুখে অত্যন্ত নাজুক।

এই মডেলের মাশুল তাদেরই দিতে হয়—যারা প্রতিনিয়ত ভালো করার চাপের মুখে থাকে, যারা অবিরাম প্রতিযোগিতার এই যুক্তির সাথে মানিয়ে নিতে পারে না এবং সেই সব সম্প্রদায় যাদের অভ্যন্তরীণ বন্ধনগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে। স্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতার এই মানসিকতা উদ্বেগ, দীর্ঘস্থায়ী ব্যর্থতার বোধ এবং সম্পর্কের মানবিক গুণাবলী হারিয়ে ফেলার মতো পরিস্থিতির জন্ম দেয়। অন্যদিকে, এই মডেল থেকে লাভবান হয় বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো; কারণ তারা উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং সামাজিক বাছাই প্রক্রিয়ার হাতিয়ার হিসেবে এই অবিরাম প্রতিযোগিতাকে কাজে লাগায়।

একটি নতুন পদ্ধতির প্রস্তাব মানেই সব ধরনের প্রতিযোগিতা নির্মূল করা নয়; কারণ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। মূল বিষয়টি হলো প্রতিযোগিতাকে একটি সুস্থ সীমার মধ্যে নিয়ে আসা, যাতে এটি সামাজিক জীবনের একমাত্র বা পরম ভিত্তি হয়ে না দাঁড়ায়। এই পরিবর্তনের প্রথম ধাপটি হলো প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশের আমূল সংস্কার। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, কোম্পানি এবং সর্বজনীন পরিসরে সহযোগিতামূলক কর্মপদ্ধতিকে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করা প্রয়োজন। বাস্তব ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো এমন সব কর্মপদ্ধতি গড়ে তোলা যা পারস্পরিক পরিপূরক দক্ষতা, যৌথ প্রকল্প, অভিন্ন লক্ষ্য এবং এমন সব স্বীকৃতি ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত—যেখানে কেবল বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স নয়, বরং যৌথ অবদানকে মূল্যায়ন করা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক শিখন পদ্ধতি, দলগতভাবে সমস্যা সমাধান এবং যৌথ নেতৃত্বের জন্য প্রশিক্ষণের বিষয়গুলোকে আরও জোরদার করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে সমবায়, অংশীদারিত্ব এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক মডেলগুলোকে উৎসাহিত করা উচিত; কারণ এগুলো যৌথভাবে সমাধান তৈরির পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা বা 'কর্তৃত্ব' সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার বাস্তবসম্মত উপায়। এর মূল লক্ষ্য হলো নিরন্তর সংঘাতের মানসিকতা বা যুক্তিকে পরিত্যাগ করে যৌথ অগ্রগতির মানসিকতা বা যুক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা। সমষ্টিগত বুদ্ধিমত্তা বা 'কালেক্টিভ ইন্টেলিজেন্স' বিভিন্ন সক্ষমতাকে জনকল্যাণের লক্ষ্যে একত্রিত হতে সহায়তা করে, যার ফলে আরও টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিস্থাপক সমাধান বেরিয়ে আসে।

তবে এটা সহজেই অনুমেয় যে, যেসব সংস্কৃতি তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত এবং যেসব কাঠামো কেবল ব্যক্তিগত পারফরম্যান্স বা দক্ষতার ভিত্তিতেই মূল্য নির্ধারণ করে, সেখানে এই রূপান্তরটি প্রবল বাধার সম্মুখীন হবে। র‍্যাঙ্কিং ও বর্জনের নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষাব্যবস্থা, নিরন্তর প্রতিযোগিতামূলক পেশাগত পরিবেশ, অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকাকেই সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা এবং যৌথ অর্জনের চেয়ে বিচ্ছিন্ন ফলাফলকে পুরস্কৃতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই এই বাধার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের অবশ্যই মানব বিকাশের ক্ষেত্রগুলোকে—বিশেষ করে স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে—এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে পারস্পরিক সহযোগিতাকে

আর কোনো গৌণ বিষয় হিসেবে দেখা না হয়। দলীয় প্রকল্প, যৌথভাবে সমস্যার সমাধান, সম্মিলিত অবদানের ভিত্তিতে মূল্যায়ন এবং সহযোগিতামূলক নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ—এসবই হওয়া উচিত এই নতুন সংস্কৃতির ভিত্তি। মানুষ যখন জীবনের শুরুতেই বুঝতে পারে যে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ নিজের অবস্থান হারানো নয়, তখন সামাজিক মানসিকতায় পরিবর্তন আসতে শুরু করে। দ্বিতীয় ধাপটি কার্যকর করতে হবে কর্মক্ষেত্র, স্থানীয় সম্প্রদায় এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে। এর অর্থ হলো, কেবল তুলনামূলক মূল্যায়নের পদ্ধতির পরিবর্তে এমন সব ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা বিভিন্ন দক্ষতার সমন্বয়, অভিন্ন লক্ষ্য এবং সম্মিলিত ফলাফলকে গুরুত্ব দেয়। বহু-বিভাগীয় বা মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি দল গঠন, সহযোগিতামূলক প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, সমতল বা অনুভূমিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং সমবায় ও বিভিন্ন সংগঠনের শক্তিশালীকরণ—এসবই এমন কিছু বাস্তব পদক্ষেপ যা প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে একমাত্র বা পরম নীতি হিসেবে গণ্য করার ধারণাকে দুর্বল করে দেয়।

শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, উদ্ভাবন এবং সামাজিক জীবনের মতো বিভিন্ন স্তরে সহযোগিতাকে শক্তিশালী করে এমন সব সরকারি নীতি প্রণয়নে সমাজের বৃহত্তর অংশের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। প্রতিটি নতুন সহযোগিতামূলক কাঠামোর লক্ষ্য হওয়া উচিত অন্যকে হুমকি হিসেবে দেখার মানসিকতা কমিয়ে পারস্পরিক নির্ভরতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করা। সহযোগিতাকে কেবল একটি নৈতিক ব্যতিক্রম হিসেবে নয়, বরং সামাজিক অগ্রগতির একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কোনো সমাজই তার সদস্যদের একে অপরকে চিরস্থায়ী শত্রু হিসেবে দেখতে শেখানোর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী সংহতি ও ভবিষ্যৎ ধরে রাখতে পারে না। প্রকৃত অগ্রগতি বিচ্ছিন্নতা থেকে নয়, বরং যৌথভাবে কিছু গড়ে তোলার সক্ষমতা থেকেই আসে। সহযোগিতামূলক পরিবেশ অধিকতর সামাজিক উদ্ভাবন, মানসিক সুস্থতা এবং জটিল সমস্যা সমাধানের দক্ষতা তৈরি করে; কারণ এ ধরনের পরিবেশ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিভার সমন্বয়ের সুযোগ করে দেয়। প্রতিযোগিতার সহজাত প্রবৃত্তি কাটিয়ে ওঠার অর্থ হলো এটা স্বীকার করে নেওয়া যে, বর্তমানের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর মোকাবিলায় সম্মিলিত পদক্ষেপ প্রয়োজন। বৈশ্বিক সংকট, সামাজিক বৈষম্য এবং টেকসই উন্নয়নের মতো বিষয়গুলোর সমাধান বিচ্ছিন্ন বিবাদের মাধ্যমে নয়, বরং ব্যাপক পরিসরে সহযোগিতার সক্ষমতার মাধ্যমেই সম্ভব হবে। ভবিষ্যৎ তাদের জন্য নয় যারা একে অপরকে পরাজিত করে, বরং তাদের জন্য যারা একসঙ্গে গড়ে তুলতে শেখে।

৯. সমন্বিত ও স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায়

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনকে ক্ষুণ্ণ না করে কীভাবে একটি শক্তিশালী সমাজ গড়ে তোলা যায়? এটি সমসাময়িক বিশ্বের একটি প্রধান দ্বিধা: বৃহত্তর সহযোগিতামূলক কাঠামোর সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করেই নিজ নিজ এলাকায় মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা। চরম কেন্দ্রীকরণ কিংবা বিচ্ছিন্ন খণ্ড-বিখণ্ডতার পথ বেছে নেওয়ার পরিবর্তে, এই প্রস্তাবনাটি কার্যগত স্বাধীনতা এবং সমষ্টিগত সমন্বয়ের মধ্যে একটি ভারসাম্য খোঁজার চেষ্টা করে।

বর্তমানে, দৈনন্দিন জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে এমন অনেক সিদ্ধান্ত—যেমন যাতায়াত ব্যবস্থা, আবাসন, খাদ্য, শিক্ষা এবং সম্পদের ব্যবহার—স্থানীয় বাস্তবতার চেয়ে অনেক দূরের কোনো কাঠামোর মাধ্যমে নেওয়া হয়। এর ফলে প্রশাসনিক ধীরগতি দেখা দেয়, জনগণের সুনির্দিষ্ট চাহিদার প্রতি যথাযথ মনোযোগের অভাব ঘটে এবং নাগরিক ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয়। যখন কোনো সম্প্রদায়ের স্বায়ত্তশাসন সীমিত থাকে, তখন তারা এমন সব প্রমিত বা গৎবাঁধা মডেলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে যা সবসময় প্রতিটি অঞ্চলের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না।

বর্তমান মডেলের সমস্যাটি নিহিত রয়েছে অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ এবং গভীর আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে। এর মূল কারণ হলো উচ্চতর প্রশাসনিক স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কুক্ষিগত থাকা; অথচ এই স্তরগুলো সেই সব সম্প্রদায়ের বাস্তব পরিস্থিতি থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে যাদের জন্য তারা আইন প্রণয়ন বা হস্তক্ষেপ করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত, নিরাপত্তা, আবাসন এবং সম্পদ ব্যবহারের মতো বিষয়গুলোর সিদ্ধান্ত এমন সব আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মাধ্যমে নেওয়া হয় যাদের স্থানীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। এর ফলে প্রতিটি অঞ্চলের প্রকৃত চাহিদার সাথে সরকারি নীতিমালার সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন হয়ে পড়ে। এর চূড়ান্ত পরিণতি হলো সম্পদ ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা, সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের অভাব এবং সমষ্টিগত একাত্মবোধের দুর্বলতা।

যখন কোনো সম্প্রদায় সমাধান তৈরির প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় না, তখন ব্যবস্থাটি তার বৈধতা ও কার্যকারিতা হারায়। এই বিচ্ছিন্নতা সমাজের বাস্তব জীবনে অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে ধরা পড়ে: স্থানীয় চাহিদার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ গণপূর্ত কাজ, ভুল

লক্ষ্যভিত্তিক সামাজিক কর্মসূচি, সম্পদের অপচয় এবং দৈনন্দিন জরুরি সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধানে ব্যর্থতা। এই কাঠামোর মাশুল দিতে হয় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের; তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অবহেলা, নিম্নমানের পরিষেবা এবং রাজনৈতিকভাবে উপেক্ষিত থাকার স্থায়ী অনুভূতির মধ্যে জীবন কাটাতে হয়। পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব, অপর্যাপ্ত যাতায়াত ব্যবস্থা, শহুরে নিরাপত্তাহীনতা এবং কথা শোনা ও পদক্ষেপ নেওয়ার মতো কার্যকর মাধ্যমের অনুপস্থিতি—এসবের মধ্য দিয়েই তাদের ভোগান্তি প্রকাশ পায়।

অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ সম্প্রদায়গুলোর নিজেদের পরিবর্তনের কারিগর হিসেবে গড়ে ওঠার সক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। যখন সমস্ত সমাধান ওপরমহল থেকে আসে, তখন জনগণকে নিষ্ক্রিয় অবস্থানে ঠেলে দেওয়া হয় এবং তারা কেবল অপর্যাপ্ত নীতিমালা গ্রহণকারী হিসেবেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এর ফলে সামাজিক নিষ্ক্রিয়তা বা উদ্দীপনার অভাব দেখা দেয়, প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থার সংকট তৈরি হয় এবং সম্প্রদায়ের পারস্পরিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। এই কাঠামোর মাধ্যমে যারা লাভবান হয়, তারা হলো রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার এমন সব কেন্দ্র—যারা কর্তৃত্ব, বাজেট ও প্রভাব বিস্তারের সক্ষমতাকে নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখে।

সমন্বিত ও স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায়ের প্রস্তাবটির মূল কথা হলো—বৃহত্তর সহযোগিতামূলক কাঠামোর সাথে কৌশলগত সংযোগ বজায় রেখেই বিভিন্ন এলাকা, শহর ও অঞ্চলের নিজস্ব ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই রূপান্তরের প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত সরাসরি আঞ্চলিক বিষয়গুলোর—যেমন নগর পরিকল্পনা, বাজেটের অগ্রাধিকার নির্ধারণ, সামাজিক নীতি এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা—ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে ধাপে ধাপে বিকেন্দ্রীকরণ করা। এর অর্থ হলো—আলোচনা-ভিত্তিক কমিউনিটি কাউন্সিল, স্থায়ী স্থানীয় সভা, বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণমূলক বাজেট ব্যবস্থা এবং পরিচালনগত স্বায়ত্তশাসনসহ আঞ্চলিক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা। প্রতিটি সম্প্রদায়েরই অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা, সমাধানের পথ তৈরি করা এবং নিজেদের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দকৃত সম্পদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পরিচালনার প্রকৃত সক্ষমতা থাকতে হবে। একই সাথে, জ্ঞান, প্রযুক্তি, অর্থায়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা আদান-প্রদানের লক্ষ্যে এই এককগুলোকে অবশ্যই আঞ্চলিক ও জাতীয়

সহযোগিতামূলক ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকতে হবে। আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সম্পৃক্ততা বা নৈকট্য এবং কৌশলগত পারস্পরিক নির্ভরতার মধ্যে সমন্বয় ঘটাতে হবে। এর অর্থ হলো, স্থানীয় সমস্যা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকেই উঠে আসবে; অন্যদিকে আঞ্চলিক অবকাঠামো, জ্বালানি নিরাপত্তা, জটিল চিকিৎসা সেবা, উচ্চশিক্ষা ও লজিস্টিকসের মতো বৃহত্তর পরিসরের বিষয়গুলো বিস্তৃত সহযোগিতামূলক নেটওয়ার্কের কাঠামোর মধ্যেই পরিচালিত হবে। এভাবেই স্বায়ত্তশাসন বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত না হয়ে বরং একটি সমন্বিত ব্যবস্থার মধ্যে স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির উপায় হয়ে উঠবে।

প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও বাজেট-সংক্রান্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার অভ্যস্ত কেন্দ্রীয় কাঠামোগুলোর কাছ থেকে এই মডেলটি যে বাধার সম্মুখীন হবে, তা সহজেই অনুমেয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নিজেদের হাতে ধরে রাখা, স্থানীয় প্রক্রিয়ায় অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি এবং কেবল দূরবর্তী প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রগুলোরই দক্ষতার সাথে পরিচালনার কারিগরি সক্ষমতা রয়েছে—এমন ধারণা প্রচারের মাধ্যমেই এই বাধাগুলো প্রকাশ পায়। কেবল আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব নয়, বরং সম্পদ, তথ্য ও বিনিয়োগের অগ্রাধিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণও কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে; ফলে স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের দৈনন্দিন সমস্যাগুলোর বিষয়ে প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা পায় না।

তাই, স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা ধাপে ধাপে বাড়ানোর মধ্য দিয়ে এই রূপান্তরটি ছোট, ধারাবাহিক ও কৌশলগতভাবে ক্রমপুঞ্জীভূত পদক্ষেপের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে কমিউনিটি কাউন্সিল, আঞ্চলিক সভা, পাড়া-ভিত্তিক সংগঠন এবং অংশগ্রহণমূলক ফোরামগুলোকে আনুষ্ঠানিক বৈধতা ও সরকারি তথ্যের অবাধ সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে শক্তিশালী করা। স্বাস্থ্য, যাতায়াত ব্যবস্থা, নিরাপত্তা, শিক্ষা ও অবকাঠামোর মতো বিষয়গুলোতে অগ্রাধিকার নির্ধারণে যখন সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করতে শুরু করে, তখন বিকেন্দ্রীকরণকে টিকিয়ে রাখার মতো একটি শক্তিশালী সামাজিক ভিত্তি তৈরি হয়। দ্বিতীয় ধাপটি অবশ্যই প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সম্পন্ন হতে হবে—অর্থাৎ ছোট আঞ্চলিক পরিসরে ক্ষমতা ও বাজেট পর্যায়ক্রমে হস্তান্তর করতে হবে। অংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রণয়ন, স্থানীয় তহবিলের সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ এবং অত্যাবশ্যকীয় সেবার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও স্বায়ত্তশাসনসহ বিভিন্ন উদ্যোগ

বিকেন্দ্রীকরণকে বাস্তব ও দৃশ্যমান করে তোলে। স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিটি সফল অর্জনই এই যুক্তিকে দুর্বল করে দেয় যে, কেবল কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাই শৃঙ্খলা ও দক্ষতা নিশ্চিত করতে পারে। এরপর, স্বায়ত্তশাসনের সাথে কৌশলগত সমন্বয়ের সমন্বয় ঘটানো অপরিহার্য হয়ে পড়ে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী বা কমিউনিটিগুলোর বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো কাজ করা উচিত নয়; বরং তাদের একটি বহু-স্তরের সহযোগিতামূলক নেটওয়ার্কের অংশ বা সংযোগবিন্দু হিসেবে কাজ করা প্রয়োজন। এর অর্থ হলো তথ্য একত্রীকরণ, যৌথ পরিকল্পনা ও সম্পদ ভাগাভাগির জন্য আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে এমন সব ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যাতে স্থানীয় সিদ্ধান্তগুলো বৃহত্তর লক্ষ্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। মূল কৌশলটি হলো এমন একটি মডেল তৈরি করা যেখানে মানুষের পারস্পরিক নৈকট্য তাৎক্ষণিক প্রয়োজনগুলো মেটায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যকার সহযোগিতা কাঠামোগত সমাধানগুলোকে সহায়তা করে।

সুশাসনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে মানুষের পারস্পরিক নৈকট্য, আঞ্চলিক দক্ষতা এবং কৌশলগত সহযোগিতাকে বিভিন্ন স্তরে একত্রিত করার সক্ষমতার ওপর। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন জনগণের প্রকৃত প্রয়োজনে দ্রুত ও যথাযথ সাড়া দেওয়ার সুযোগ করে দেয়; অন্যদিকে নেটওয়ার্কের সাথে একীভূতকরণ বিচ্ছিন্নতা রোধ করে এবং সম্পদ ও সর্বোত্তম কর্মপদ্ধতি বিনিময়ের নিশ্চয়তা দেয়। এই মডেলটি নাগরিক অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করে, প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়ায় এবং সামাজিক উদ্ভাবনকে ত্বরান্বিত করে—কারণ এর ফলে তৃণমূল পর্যায় থেকে সমাধান উঠে আসে এবং অন্য কমিউনিটিগুলোতেও তা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

পরস্পর সংযুক্ত স্বায়ত্তশাসিত কমিউনিটিগুলো সামাজিক সংগঠনের এমন এক নতুন রূপকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা স্থানীয় পরিচিতি ও বৃহত্তর সহযোগিতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম। সুশাসনের ভবিষ্যতের জন্য এমন সব কাঠামোর প্রয়োজন হবে যা অধিকতর নমনীয়, অংশগ্রহণমূলক এবং আঞ্চলিকভাবে বুদ্ধিদীপ্ত বা বিচক্ষণ। কেন্দ্রীয় কাঠামোর ওপর নির্ভরতা বজায় রাখার অর্থ হলো অদক্ষতা দীর্ঘায়িত করা। অধিকতর স্থিতিস্থাপক ও মানবিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসিত ও পারস্পরিক সংযুক্ত কমিউনিটি নেটওয়ার্কের দিকে এগিয়ে যাওয়া এখন একটি কৌশলগত আবশ্যকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১০. পরিবার, সম্প্রদায় এবং শহর

একটি সমাজকে প্রকৃতপক্ষে কী টিকিয়ে রাখে: বিশাল সব প্রতিষ্ঠান, নাকি ঘর, রাস্তা ও শহরের মধ্যে গড়ে ওঠা মানবিক সম্পর্ক? সামাজিক জীবনের সেই বাস্তব ভিত্তিটিই এই বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। যেকোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামোর আগেই, এই তিনটি পরিসরেই মানুষের মূল্যবোধ, নিরাপত্তা, আপনত্বের বোধ এবং নিজস্ব পরিচয় গড়ে ওঠে। যখন এই স্তম্ভগুলোর কোনো একটি দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন পুরো সামাজিক কাঠামোতেই তার প্রভাব পড়ে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে, মানুষ এবং তাদের বসবাসের স্থানের মধ্যে এক ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পরিবারগুলোর দৈনন্দিন রুটিন বা জীবনযাত্রা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ছে, সম্প্রদায়ের মধ্যে সহাবস্থানের বন্ধন শিথিল হচ্ছে এবং শহরগুলো ক্রমশ কেবল যান্ত্রিক কার্যকারিতার কেন্দ্র হয়ে উঠছে—হারিয়ে ফেলছে তাদের মানবিক রূপ। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, শহুরে নিরাপত্তাহীনতা, স্থানীয় সংহতির দুর্বলতা এবং সমষ্টিগত পরিচয়ের বোধ হারিয়ে যাওয়াই এখনকার সাধারণ চিত্র। পরিবারগুলো তাদের সম্প্রদায় ও শহরের সাথে যেভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলে, তা তাদের শিক্ষা, মানসিক স্বাস্থ্য, চলাচলের ধরন, কর্মজীবন এবং জীবনযাত্রার মানের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে।

বর্তমান মডেলটির মূল সমস্যা নিহিত রয়েছে মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থানের মৌলিক স্তরগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতার মাঝে। এর কারণ হলো এমন সব সামাজিক ও শহুরে কাঠামো, যা পারস্পরিক সহাবস্থান, মানুষের সাথে মানুষের সাক্ষাৎ ও একে অপরের প্রতি যত্নশীল হওয়ার বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করে উৎপাদনশীলতা, যাতায়াত, অর্থনৈতিক আদান-প্রদান এবং ভোগ-বিলাসকেই অগ্রাধিকার দেয়। শহরগুলোকে অনেকাংশেই পণ্য, যানবাহন ও কাজের প্রবাহ বজায় রাখার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়েছে; কিন্তু মানবিক বন্ধন তৈরির বিষয়টি সেখানে খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। এর ফলে পরিবার ও সম্প্রদায়ের মধ্যকার বন্ধন ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। এর চূড়ান্ত পরিণতি হলো এমন সব শহরের সৃষ্টি, যেখানে মানুষ শারীরিকভাবে একে অপরের কাছাকাছি থাকলেও মানসিকভাবে অনেক দূরে অবস্থান করে।

এই বিচ্ছিন্নতার চিত্র ফুটে ওঠে দীর্ঘ সময় ধরে চলা যাতায়াতের প্রক্রিয়ায় যা বাবা-মা ও সন্তানদের একে অপরের থেকে দূরে সরিয়ে রাখে; পারিবারিক আলাপ-আলোচনার সময়ের অভাবে; প্রতিবেশীদের সাক্ষাতের সুযোগ কমে যাওয়ায়; এবং শহুরে পরিবেশের

এমন এক রূপান্তরে যেখানে শহরটি আর আপন কোনো জায়গা বা 'নিজের এলাকা' হিসেবে নয়, বরং কেবল এক 'চলাচলের পথ' বা ট্রানজিট হিসেবে গণ্য হয়। এই বিচ্ছিন্নতার মাশুল গুনতে হয় তাদেরই—যারা শহুরে জীবনের ক্লান্তিকর গতির চাপে পিষ্ট পরিবার, অর্থবহ মিথস্ক্রিয়া থেকে বঞ্চিত শিশু, একাকী প্রবীণ এবং পারস্পরিক সহায়তার সক্ষমতা হারিয়ে ফেলা বিভিন্ন সম্প্রদায়। একাকীত্ব, মানসিক অসুস্থতা, নিজের অস্তিত্বের গুরুত্বহীনতা বা 'নামহীন' হয়ে পড়ার অনুভূতি এবং সামাজিক সুরক্ষা কাঠামোর ক্রমবর্ধমান ভঙ্গুরতার মধ্য দিয়ে এই ভোগান্তি প্রকাশ পায়।

যখন শহর আর সম্প্রদায়ের জীবনেরই একটি বর্ধিত অংশ হিসেবে কাজ করে না, তখন আপনত্বের বোধ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সামাজিক সহযোগিতার সক্ষমতাও কমে যায়। এর ফলে এমন এক সমাজের সৃষ্টি হয় যেখানে ব্যক্তি নিজেকে মানুষের ভিড়ে পরিবেষ্টিত দেখলেও প্রকৃত মানবিক সংযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। এই বিচ্ছিন্নতা নিরাপত্তাহীনতা ও সামাজিক উদাসীনতা বাড়ায় এবং বাসিন্দাদের নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক আস্থাকে ক্ষুণ্ণ করে। শহুরে পরিবেশ সমষ্টিগত জীবনকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নতা ও অদৃশ্যতাকে বাড়িয়ে তোলে। পরিবার, সম্প্রদায় এবং শহরের মধ্যে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। এই পরিবর্তনের প্রথম ধাপটি হলো কেবল অর্থনৈতিক বা কাঠামোগত সূচকের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে নগর পরিকল্পনাকে নতুন করে বিবেচনা করা। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো এমন সব এলাকা বা পাড়া গড়ে তোলা যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পরিষেবা, স্কুল, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, সবুজ এলাকা, স্থানীয় দোকানপাট এবং সামাজিক মেলামেশার স্থানগুলো হাতের নাগালে থাকে; এর ফলে অতিরিক্ত যাতায়াত কমে এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে দৈনন্দিন উপস্থিতি ও যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। এই প্রস্তাবনার মূল কথা হলো শহরকে সম্প্রদায়ের জীবনেরই একটি সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে বিবেচনা করা। এর জন্য প্রয়োজন এমন সব অন্তর্ভুক্তিমূলক সর্বজনীন স্থান তৈরি করা—যেমন চত্বর, কমিউনিটি সেন্টার, বিনোদন কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক স্থাপনা এবং চলাচলের নিরাপদ পথ—যা স্বতঃস্ফূর্ত সাক্ষাৎ ও নিরন্তর মিথস্ক্রিয়াকে উৎসাহিত করে। পাশাপাশি, সরকারি নীতিমালার মাধ্যমে স্থানীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন উদ্যোগকে—যেমন প্রতিবেশীদের পারস্পরিক সহায়তা নেটওয়ার্ক, বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের মধ্যে সংযোগকারী কর্মসূচি, স্থানীয় সমবায় এবং অংশগ্রহণমূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থা—উৎসাহিত করা উচিত। এই মডেলে পরিবারকে সমষ্টিগত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো একক

হিসেবে নয়, বরং সেই জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য ও কেন্দ্রীয় অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এর অর্থ হলো কর্মজীবন ও পারিবারিক জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাকারী নীতিগুলোকে শক্তিশালী করা, পরিচর্যা বা সেবা কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানো, শিশু ও বয়স্কদের সহায়তা প্রদান এবং এমন পরিবেশ তৈরি করা যা শহুরে পরিসরে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক হয়। শহরকে কেবল যাতায়াত বা চলাচলের স্থান হিসেবে নয়, বরং পুনরায় প্রাণবন্ত জীবনযাপনের কেন্দ্রস্থল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

এটা স্পষ্ট যে, আবাসন বা রিয়েল এস্টেট বাজার, গণপরিবহন ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল নগর-কাঠামোতে এই পরিবর্তনটি বাধার সম্মুখীন হবে। শহরের অপরিকল্পিত বিস্তার, শহুরে জমির দামের অস্বাভাবিক ও ফটকাবাজি-নির্ভর বৃদ্ধি এবং দৈনন্দিন জীবনের গুণমানের চেয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রবাহকে প্রাধান্য দেওয়ার মধ্য দিয়েই এই বাধাগুলো প্রকাশ পায়। যেসব বড় আবাসন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, অবকাঠামো খাত এবং প্রশাসনিক কাঠামো শহরের সাফল্যকে কেবল প্রবৃদ্ধি ও চলাচলের (circulation) মাপকাঠিতে বিচার করতে অভ্যস্ত, তারা সম্প্রদায়ের চাহিদাকেন্দ্রিক যেকোনো নতুন উদ্যোগকে দক্ষতা ও উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে গণ্য করে। অনেক ক্ষেত্রেই, জীবনযাপনের ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার আগেই শহরের স্থান বা পরিসরকে কেবল একটি অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রকৃত পরিবর্তনের প্রথম ধাপটি হলো নগর-পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ জোরদার করা—যার মধ্যে স্থানীয় পরিষদ, বাধ্যতামূলক গণশুনানি, কমিউনিটি ফোরাম এবং এলাকা-ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক বাজেট অন্তর্ভুক্ত। যখন পরিবার ও সম্প্রদায়গুলো যাতায়াত ব্যবস্থা, বসবাসের এলাকা, নিরাপত্তা, আবাসন এবং নিকটস্থ পরিষেবাগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করে, তখন শহরটি আর ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো নকশা থাকে না; বরং তা মানুষের প্রকৃত চাহিদার প্রতিফলন ঘটাতে শুরু করে। পরবর্তী পরিবর্তনটি আসতে হবে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে: যেমন—এলাকা-ভিত্তিক কমিউনিটি সেন্টার বা কেন্দ্র গড়ে তোলা, সর্বসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী উন্মুক্ত স্থান বা 'পাবলিক লিভিং এরিয়া'র প্রসার ঘটানো, মিশ্র ভূমি ব্যবহারের (mixed land use) নীতিকে উৎসাহিত করা, অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবাগুলোর বিকেন্দ্রীকরণ এবং স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নয়ন। আমাদের আবাসন, কর্মস্থল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান,

স্বাস্থ্যসেবা এবং সামাজিক মেলামেশার স্থানগুলোকে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে; এর ফলে ক্লান্তিকর যাতায়াত কমবে এবং পরিবার ও সম্প্রদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক সময়টুকু পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে।

একটি সমাজের গুণমান বিচার করতে হবে এই বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে—সেখানকার পরিবারগুলো কীভাবে জীবনযাপন করছে, সম্প্রদায়গুলো একে অপরকে কীভাবে সহায়তা করছে এবং শহরগুলো তাদের কীভাবে আপন করে নিচ্ছে। এই সংযোগটি পুনঃস্থাপন করা কেবল কোনো নগর-পরিকল্পনা বা সামাজিক বিষয় নয়, বরং এটি আমাদের সম্মিলিত ভবিষ্যতের জন্য একটি কাঠামোগত আবশ্যকতা। যেখানে শহর সম্প্রদায়ের সাথে পুনরায় সংযুক্ত হয় এবং সম্প্রদায় পরিবারকে শক্তিশালী করে তোলে, সেখানেই একটি অধিকতর মানবিক ও টেকসই সভ্যতার সুদৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়।

১১. নেতা—যারা ক্ষমতা আকাঙ্ক্ষা করেন না

সমাজের নেতৃত্ব কাদের হাতে থাকা উচিত: যারা যেকোনো মূল্যে ক্ষমতা পেতে চান, নাকি তাদের হাতে যারা কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ থেকে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন? এই অধ্যায়টি সমসাময়িক রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক যুক্তির এক গভীর ও আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করে। ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে নেতৃত্বকে যুক্ত করার পরিবর্তে, এখানে প্রকৃত নেতাকে এমন একজন হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে যিনি সমষ্টিগত প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেন—কোনো মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ বা ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের আশায় নয়।

বর্তমান বিশ্বে নেতৃত্বের সাথে প্রভাব বিস্তার, দৃশ্যমানতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক আধিপত্যের লড়াইয়ের একটি গভীর যোগসূত্র তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, নেতৃত্বের আসনে আরোহণের বিষয়টি মূলত ব্যক্তিগত উন্নতির আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি ক্ষমতা ধরে রাখা, ভাবমূর্তি রক্ষা বা ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়; যার সরাসরি প্রভাব পড়ে জনসেবা বা সরকারি ব্যবস্থাপনার গুণমান, প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা এবং সামগ্রিক জনকল্যাণের ওপর।

বর্তমান ব্যবস্থার মূল সমস্যাটি নিহিত রয়েছে নেতা নির্বাচনের ও তাঁদের পুরস্কৃত করার পদ্ধতির মধ্যে। জনদায়িত্ববোধ, দক্ষতা ও নৈতিক ভারসাম্য দ্বারা চালিত ব্যক্তিদের

অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিবর্তে, এই ব্যবস্থা এমন ব্যক্তিদের পুরস্কৃত করে যাদের মূল চালিকাশক্তি হলো ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা। এর কারণ হলো এমন সব রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক কাঠামো যা উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিজয়ের বাগাড়ম্বর, জনসমক্ষে দৃশ্যমানতা এবং কৌশলগতভাবে জনসমর্থন বা শক্তি সংহত করার সক্ষমতাকে অধিক গুরুত্ব দেয়। এই যুক্তির ভিত্তিতে, যারা তীব্রভাবে ক্ষমতা আকাঙ্ক্ষা করে তারাই সহজে নেতৃত্বে উঠে আসে; সমষ্টির কল্যাণে ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য যারা সবচেয়ে যোগ্য বা প্রস্তুত, তারা নয়।

বর্তমান মডেলের পরিণতি হলো এমন সব নেতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, যারা সমাজের জন্য দৃশ্যমান ও বাস্তব ফলাফল অর্জনের চেয়ে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখা, প্রভাব বিস্তার এবং ভাবমূর্তি রক্ষার বিষয়েই বেশি মনোযোগী। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে এবং নেতৃত্ব ও জনস্বার্থের মধ্যে ক্রমশ দূরত্ব তৈরি হয়। যখন ক্ষমতা নিজেই চূড়ান্ত লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন নেতৃত্ব আর সমাজের সেবায় নিয়োজিত থাকে না, বরং তা ক্ষমতার কাঠামোকেই টিকিয়ে রাখার কাজে ব্যবহৃত হতে থাকে। তখন নেতৃত্বের পদটি আর কোনো কাজের মাধ্যম বা হাতিয়ার হিসেবে থাকে না; বরং তা একটি পরিচয়, রাজনৈতিক সম্পদ কিংবা নিজেকে টিকিয়ে রাখার মঞ্চে পরিণত হয়।

এই বিকৃতির ফলে গভীর মানবিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব পড়ে। এর মাশুল গুনতে হয় সাধারণ নাগরিকদের, যাদের ওপর এমন সব সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয় যা প্রকৃত প্রয়োজনের পরিবর্তে রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ, জোট রক্ষা বা ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা চালিত। এই ভোগান্তি বা কষ্টের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সরকারি সম্পদের অব্যবস্থাপনা, সংকটের সময় ধীরগতিতে সাড়া দেওয়া, প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থার সংকট এবং অযোগ্যতা, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা বা ক্ষমতার অপব্যবহারজনিত প্রত্যক্ষ দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে। অবকাঠামোহীন হাসপাতাল, অবহেলিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দুর্বলভাবে বাস্তবায়িত সরকারি নীতি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের অহংবোধের কারণে আরও জটিল হয়ে ওঠা সংকট—এসবই হলো অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে সৃষ্ট মানবিক ক্ষতির বাস্তব উদাহরণ। এই মডেল থেকে যারা লাভবান হয়, তারা মূলত ক্ষমতার বলয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গোষ্ঠী—যেমন রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণি, দলের রুদ্ধদ্বার কাঠামো, প্রভাব-বলয়ের নেটওয়ার্ক এবং এমন সব ব্যক্তি যারা অভ্যন্তরীণ সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল নেতাদের টিকে থাকার মাধ্যমে সুবিধা ভোগ করে। প্রাতিষ্ঠানিক কার্যপদ্ধতি এই চক্রকে আরও শক্তিশালী করে

তোলে; ফলে মেধা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিবর্তে কৌশলগত আনুগত্য এবং আত্ম-প্রচারণার সক্ষমতাকেই পুরস্কৃত করা হয়।

প্রস্তাবিত বিষয়টি হলো এমন একটি নেতৃত্ব কাঠামো গড়ে তোলা যা নৈতিক দায়বোধ ও স্বীকৃত যোগ্যতার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হবে। এর মূল কথা হলো এমন ব্যক্তিদের গুরুত্ব দেওয়া, যারা ক্ষমতাকে আকাঙ্ক্ষার বস্তু হিসেবে দেখেন না, বরং সমষ্টির কল্যাণে একে একটি সাময়িক দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেন। এই পরিবর্তনের প্রথম ধাপ হওয়া উচিত নেতৃত্বের পদে নির্বাচন, মূল্যায়ন ও বহাল রাখার প্রক্রিয়াগুলোর সংস্কার করা। এক্ষেত্রে এমন স্বচ্ছ মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে যা কারিগরি দক্ষতা, জনসেবার দীর্ঘ ইতিহাস, মানসিক ভারসাম্য এবং নৈতিক সততাকে অগ্রাধিকার দেয়। এর অর্থ হলো—আরও কঠোর কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন প্রক্রিয়া ও স্থায়ী জবাবদিহিতার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, মেয়াদের সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করা এবং এমন সব যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কাঠামো গড়ে তোলা যা অত্যধিক ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা কমিয়ে আনে। এই মডেলে নেতৃত্বকে কোনো বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত অবস্থান হিসেবে নয়, বরং একটি সেবামূলক ভূমিকা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। কেবল ক্ষমতায় জয়ী হওয়া বা টিকে থাকার ক্ষমতার ওপর নয়, বরং সামাজিক ফলাফল, সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুণমান এবং আস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত বৈধতার ওপরই মূল মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

যেকোনো রূপান্তরই গভীর বাধার সম্মুখীন হয়, বিশেষ করে এমন সব ব্যবস্থায় যেখানে ক্ষমতা কুক্ষিগত করা এবং অগ্রগতির মাপকাঠি হিসেবে প্রতিযোগিতামূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। অধিকাংশ রাজনৈতিক, করপোরেট ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে নেতৃত্বের অবস্থানে পৌঁছানোর প্রক্রিয়াটি এমন সব পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল, যা দৃশ্যমানতা, প্রতিযোগিতা এবং দীর্ঘ সময় ধরে কর্তৃত্ব ধরে রাখাকে পুরস্কৃত করে। ফলে, এই ব্যবস্থাটি এমন ব্যক্তিদেরই বেশি গুরুত্ব দেয় যারা ক্ষমতা প্রয়োগের দায়িত্ব পালনের চেয়ে ক্ষমতা দখলের দিকেই বেশি মনোযোগী। পরিবর্তনের পথে বাধা আসে বদ্ধ পদক্রম (hierarchy), অভ্যন্তরীণ প্রভাব-বলয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং এমন সাংগঠনিক সংস্কৃতির কারণে—যা নেতৃত্বকে প্রশ্নাতীত কর্তৃত্বের সমার্থক বলে ভুল করে।

এই পরিবর্তনের জন্য নেতৃত্বের ধারণাকেই সাংস্কৃতিকভাবে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন। সমাজকে নেতৃত্ব বলতে কেবল আদেশ চাপিয়ে দেওয়া, ক্যারিশমা বা আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষাকে বোঝানোর মানসিকতা ত্যাগ করতে হবে; বরং অন্যের

কথা শোনার ক্ষমতা, ভিন্নমতকে সমন্বিত করা, দায়িত্ব গ্রহণ এবং নিজের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নেওয়ার সক্ষমতার মধ্যেই নেতৃত্বকে খুঁজে নিতে হবে। যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যত্নশীলতা (ethics of care), দক্ষতা ও জবাবদিহিতার নীতিকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে, তখন কেবল ক্ষমতা-কেন্দ্রিক মানসিকতার পরিবর্তে সামাজিক কল্যাণ ও সুরক্ষায় নিবেদিত ব্যক্তিদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ ও নির্বাচনের প্রক্রিয়াতেও এই পরিবর্তন আনা জরুরি। এর অর্থ হলো এমন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা সম্প্রদায়, জনসেবা, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাস্তব কাজের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনকারী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রসারিত করবে। অধিকতর স্বচ্ছতা, বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন মানদণ্ড, ব্যবস্থাপকদের জন্য নৈতিক প্রশিক্ষণ, কাজের আবর্তন (job rotation) এবং যৌথ পরিষদের (collegiate councils) ক্ষমতা বৃদ্ধির মতো পদক্ষেপগুলো নেতৃত্বের এককেন্দ্রিকতা বা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা কমাতে পারে। সামাজিক চাপকে এমন কাঠামোগত রূপ দিতে হবে যা ক্ষমতার অত্যধিক কুক্ষিগতকরণ রোধ করে, নাগরিকদের তদারকির সুযোগ বাড়ায় এবং যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে গুরুত্ব দেয়। নেতাকে সর্বেসর্বা বা কেন্দ্রবিন্দু ভাবার মানসিকতা কমিয়ে নেতৃত্বকে একটি সেবামূলক ভূমিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এর লক্ষ্য হলো এমন ব্যবস্থার অবসান ঘটানো যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেবল তাদেরই নেতা হিসেবে বেছে নেয় যাদের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা সবচেয়ে প্রবল।

সমাজ কেবল সম্পদের অভাবে ভেঙে পড়ে না, বরং এমন নেতার অভাবেও ভেঙে পড়ে যারা ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে জনকল্যাণকে স্থান দিতে সক্ষম। প্রকৃত নেতা তিনি নন যিনি ক্ষমতার জন্য সবচেয়ে বেশি লালায়িত, বরং তিনি যিনি দায়িত্বশীলভাবে ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে ক্ষমতা প্রয়োগের গুরুত্ব ও ভার ভালোভাবে বোঝেন। যেসব নেতার ক্ষমতার প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তারা সাধারণত অধিকতর দায়িত্ববোধের সাথে নিজেদের ভূমিকা পালন করেন; ক্ষমতার পদে দীর্ঘকাল টিকে থাকার মোহ তাদের থাকে না এবং তারা কাঠামোগত ফলাফলের ওপর বেশি মনোযোগ দেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি জনগণের আস্থা বৃদ্ধি করে, সিদ্ধান্তের গুণমান উন্নত করে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর অত্যধিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ার ঝুঁকি কমায়। এটি একটি অধিকতর পরিপক্ক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলে, যেখানে ক্ষমতা শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক নয়, বরং সেবার একটি মাধ্যম। একটি সমাজের মান নির্ভর করে তার নেতৃত্বদানকারীদের মানের ওপর। যখন ক্ষমতা আর কেবল উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের আকর্ষণ করে না, বরং যোগ্য ও সচেতন

ব্যক্তিদের আহ্বান জানায়, তখনই অধিকতর বৈধ ও টেকসই শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়। প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে কে কর্তৃত্ব করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তার দ্বারা নয়, বরং কে নেতৃত্বের গুরুদায়িত্বটি সবচেয়ে ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে—তার দ্বারা।

১২. শিক্ষা ও সমষ্টিগত মুক্তি

একটি সমাজের ভবিষ্যৎ আসলে কীসের ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হওয়া উচিত: পুঞ্জীভূত সম্পদ, নাকি পৃথিবীকে বোঝার, সৃষ্টি করার ও রূপান্তর ঘটানোর সক্ষমতা? এই বিষয়টি একটি মূল ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত: জ্ঞানকে অগ্রাধিকারের কেন্দ্রে না রেখে কোনো সভ্যতা ন্যায়পরায়ণ, উদ্ভাবনী এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারে না। শিক্ষা কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির হাতিয়ারই নয়, বরং এটি এমন এক ভিত্তি যার ওপর স্বাধীনতা, অগ্রগতি এবং সমষ্টিগত চেতনা গড়ে ওঠে।

বর্তমানে জ্ঞান অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। বাস্তবে দেখা যায়, যেসব সমাজ শিক্ষায় বিনিয়োগ করে, সেখানে অধিক উৎপাদনশীলতা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, উন্নত জীবনমান এবং স্থিতিশীল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে ওঠে। একই সঙ্গে, শিক্ষা ও তথ্যের ক্ষেত্রে অসম সুযোগ সামাজিক বৈষম্যকে আরও গভীর করে তোলে এবং শৈশব থেকেই মানুষের সুযোগ-সুবিধাকে সীমিত করে দেয়। শিক্ষা মানুষের আয়, স্বাস্থ্য, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং বর্তমান সময়ের নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে।

বর্তমান সমস্যার মূল কারণ হলো কাঠামোগতভাবে শিক্ষাকে কম গুরুত্ব দেওয়া। এর পেছনে রয়েছে এমন সব ব্যবস্থা যা শিক্ষাকে একটি গৌণ ব্যয়, স্বল্পমেয়াদী ও ব্যবহারিক হাতিয়ার অথবা কেবল নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষিত বিশেষ সুবিধা হিসেবে বিবেচনা করে। মানুষের স্বকীয়তা ও সামাজিক পরিবর্তনের সক্ষমতার ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পরিবর্তে, জ্ঞানকে বাজারের তাৎক্ষণিক স্বার্থ, স্বল্পমেয়াদী রাজনৈতিক চক্র কিংবা বাজেট-সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতার কাছে গৌণ করে রাখা হয়; ফলে এটি প্রান্তিক অবস্থানে পড়ে থাকে। এর ফলে শিক্ষা লাভের সুযোগ, শিক্ষার গুণমান এবং শিক্ষাব্যবস্থায়

টিকে থাকার ক্ষেত্রে বৈষম্য ক্রমাগতভাবে পুনরুৎপাদিত হতে থাকে। পরিশেষে এমন সব সমাজ গড়ে ওঠে যা জটিল সংকট মোকাবেলায় কম প্রস্তুত, উদ্ভাবনী ক্ষমতায় দুর্বল এবং বাইরের ওপর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। এর মাশুল দিতে হয় সেইসব শিশুদের—যারা কোনো সুসংহত কাঠামো ছাড়াই স্কুলে বেড়ে ওঠে; সেইসব তরুণদের—যাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সুযোগের অভাবে সংকুচিত হয়ে পড়ে; এবং সেইসব জনগোষ্ঠীকে—যারা বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। শিক্ষাগত বৈষম্য মূলত মানসম্মত শিক্ষা প্রাপ্তির জটিলতা, স্কুল থেকে ঝরে পড়া, প্রায়োগিক সাক্ষরতার অভাব এবং ডিজিটাল ও বৈজ্ঞানিক জগত থেকে বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। দীর্ঘমেয়াদে এই ঘাটতি সীমিত আয়, অনিশ্চিত কর্মসংস্থান এবং সামাজিক অবস্থানের উন্নতির (সোশ্যাল মোবিলিটি) সুযোগ ব্যাপকভাবে কমে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর প্রভাব প্রাতিষ্ঠানিক ও কৌশলগত ক্ষেত্রেও পড়ে। যেসব সমাজ জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেয় না, তারা বাইরের তৈরি প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে; স্থানীয় পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্ষমতা ছাড়াই সমাধান আমদানি করে; এবং এমন সব সংকটের মুখে অরক্ষিত থেকে যায় যার সমাধানে কারিগরি দক্ষতা ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। যারা এই কাঠামোর মাধ্যমে লাভবান হয়, তারা মূলত এমন সব খাত বা গোষ্ঠী যারা জ্ঞানের অসমতা বজায় রাখার ফলে সুবিধা পায়—তা অর্থনৈতিক কেন্দ্রীকরণ, প্রযুক্তিগত নির্ভরতা কিংবা সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস বজায় রাখার মাধ্যমেই হোক না কেন। কাঠামোগত অজ্ঞতা তখন ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার একটি হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

আমাদের শিক্ষাকে সমষ্টিগত জীবনের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই রূপান্তরের প্রথম ধাপ হলো শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং বিশ্লেষণধর্মী প্রশিক্ষণের বিষয়গুলোকে কেবল বারবার কাটছাঁটের শিকার হওয়া কোনো আপতিক ব্যয় হিসেবে না দেখে, বরং সেগুলোকে কেন্দ্রীয় ও স্থায়ী বিনিয়োগ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। বাস্তব ক্ষেত্রে এর জন্য প্রয়োজন প্রাথমিক, কারিগরি ও উচ্চশিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য স্থিতিশীল ও ক্রমবর্ধমান অর্থায়ন, যার সাথে থাকবে সম্প্রসারণ ও গুণগত মান উন্নয়নের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য। স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চতর গবেষণা ও বিশেষায়িত জ্ঞান অর্জনের স্তর পর্যন্ত—সর্বত্রই সহজলভ্য প্রশিক্ষণের একটি নিরবচ্ছিন্ন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এর অর্থ হলো শিক্ষাগত অবকাঠামোর সম্প্রসারণ, প্রযুক্তি ও সংযোগের ক্ষেত্রে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের

মাধ্যমে শিক্ষকতা পেশার মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা কেন্দ্র ও উদ্ভাবনী নেটওয়ার্কগুলোকে শক্তিশালী করা। শিক্ষাকে কেবল অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির একটি মাধ্যম হিসেবে নয়, বরং বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকত্ব ও সমষ্টিগত স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। এমন একটি সামাজিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা জরুরি যা জ্ঞানকে বৈধ ক্ষমতার প্রধান উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজে মর্যাদা কেবল বস্তুগত সম্পদ আহরণের ওপর নির্ভর করবে না, বরং তা নির্ধারিত হবে বোঝা, সৃষ্টি করা, শেখানো এবং জনকল্যাণে অবদান রাখার সক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে। এই মডেলে জ্ঞান আর কোনো বিশেষ সুবিধা বা বিলাসিতা নয়, বরং সামাজিক জীবনের এক অপরিহার্য অবকাঠামোয় পরিণত হয়।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে কেবল একটি গৌণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা কিংবা জ্ঞান অর্জনের সুযোগকে সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য তৈরির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের অভ্যস্ততা রয়েছে—এমন সব ব্যবস্থায় এই রূপান্তর প্রক্রিয়া বাধার সম্মুখীন হয়। এই বাধা নানাভাবে প্রকাশ পায়: দীর্ঘস্থায়ী অর্থায়নের অভাব, অবকাঠামোগত আঞ্চলিক বৈষম্য, শিক্ষকদের অবমূল্যায়ন, উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রে বাছাইপ্রক্রিয়া বা সীমাবদ্ধতা এবং এমন সব সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা বজায় রাখা যা জ্ঞানকে কেবল বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তদের অধিকারে পরিণত করে। জ্ঞানকে এখানে মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে নয়, বরং সামাজিক অবস্থান নির্ধারণের ছাঁকনি হিসেবে ব্যবহার করা হয়; ফলে আধুনিক যুগের নতুন এক ধরনের বর্ণপ্রথা বা শ্রেণিবিভাগ তৈরি হয় এবং সমষ্টিগত অগ্রগতির পথ সংকুচিত হয়ে পড়ে। সুতরাং, এই ব্যবস্থাটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বাস্তবতা অনুধাবন ও পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় হাতিয়ারগুলো ব্যবহারের পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত রেখে কাঠামোগত নির্ভরশীলতা বজায় রাখে।

প্রথম পদক্ষেপটি হলো শৈশবকালীন শিক্ষা, মৌলিক শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষাকে প্রকৃত গুণমানসহ সর্বজনীন করে তোলা, যাতে একজন ব্যক্তির জীবনের শুরুর পরিস্থিতিই তার বুদ্ধিবৃত্তিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে না দেয়। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত অবকাঠামো, স্কুলে খাবারের ব্যবস্থা, সংযোগ বা ইন্টারনেট সুবিধা, শিক্ষকদের ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার উপকরণ ও পরিবেশের ক্ষেত্রে সবার সমান সুযোগ। যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে অধিক সুযোগ, বৃহত্তর স্বাধীনতা এবং সমালোচনামূলক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট সুফল দেখতে পায়, তখন শিক্ষা কেবল

একটি বিমূর্ত প্রতিশ্রুতি না থেকে সামাজিক অগ্রাধিকারের বিষয়ে পরিণত হয়। এরপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাজেট ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা জরুরি। এর অর্থ হলো শিক্ষাকে জননীতির মূল কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা—যার মধ্যে থাকবে বাধ্যতামূলক বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরি কেন্দ্র ও প্রায়োগিক গবেষণার প্রসার। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধের কর্মসূচি, বৃত্তি প্রদান, উচ্চশিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় পর্যায়ে বিজ্ঞানচর্চায় প্রণোদনা এবং স্কুল, সম্প্রদায় ও উৎপাদনশীল খাতের মধ্যে সমন্বয়—এসব পদক্ষেপ জ্ঞান অর্জনের সুযোগকে ক্রমশ সুনিশ্চিত ও অপরিবর্তনীয় করে তুলতে পারে। জনমত বা জনগণের চাপকে শক্তিশালী শিক্ষা পরিষদ গঠন, স্কুলের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, সম্পদের তদারকি এবং শিক্ষাকে রাষ্ট্রের স্থায়ী অগ্রাধিকার হিসেবে সুরক্ষাদানকারী আইনি কাঠামোয় রূপান্তর করতে হবে। আমাদের উচিত পিছিয়ে পড়ার বা ব্যর্থতার সুযোগ কমিয়ে আনা এবং এই বোঝাপড়াটি আরও বিস্তৃত করা যে, শিক্ষা কোনো ব্যয় নয়, বরং একটি সভ্যতার ভিত্তি বা অবকাঠামো। আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যেন প্রতিটি শিক্ষিত প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্মের আরও এগিয়ে যাওয়ার সক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলে।

জ্ঞানকে নিজেদের সমষ্টিগত অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন না করে কোনো সমাজই প্রকৃত সার্বভৌমত্ব, দীর্ঘস্থায়ী ন্যায়বিচার কিংবা টেকসই ভবিষ্যৎ অর্জন করতে পারে না। যেখানে শিক্ষাকে অবহেলা করা হয়, সেখানে নির্ভরশীলতা বাড়ে; আর যেখানে একে গুরুত্ব দেওয়া হয়, সেখানে মুক্তির বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি হয়। শিক্ষার সুযোগ সর্বজনীন করার মাধ্যমে কাঠামোগত বৈষম্য কমে, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক, পরিবেশগত ও প্রযুক্তিগত সংকটের মুখে সামাজিক সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা প্রসারিত হয়। তাছাড়া, অধিক শিক্ষিত জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অধিক সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করে, যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে আরও গ্রহণযোগ্য ও কার্যকর করে তোলে। জ্ঞান যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন তা সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে। বস্তুগত সম্পদ হারিয়ে যেতে পারে কিংবা রাজনৈতিক কাঠামোর পুনর্গঠন হতে পারে, কিন্তু অর্জিত ও ভাগ করে নেওয়া জ্ঞানই একটি সভ্যতার সবচেয়ে শক্তিশালী রূপান্তরের চালিকাশক্তি হিসেবে টিকে থাকে। শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া কেবল একটি কৌশলগত সিদ্ধান্তই নয়, বরং এটি একটি অধিকতর মুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক ও টেকসই ভবিষ্যতের অপরিহার্য শর্ত।

১৩. সবার জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

কেন সর্বাধুনিক জ্ঞানচর্চা আজও অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধার বেড়াজালে সীমাবদ্ধ? সমসাময়িক বিশ্বের একটি প্রধান বৈপরীত্য থেকেই এই আলোচনার সূত্রপাত: তথ্য-প্রাচুর্য ও বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের এই যুগেও মানসম্মত উচ্চশিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত অসম। জ্ঞান যদি সামাজিক পরিবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি হয়, তবে তার প্রসার কেবল গুটিকয় মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না।

বর্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সৃষ্টি, পেশাগত প্রশিক্ষণ এবং সমাজের সাংস্কৃতিক বিকাশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। অথচ অত্যধিক ব্যয়, অত্যন্ত কঠোর বাছাই প্রক্রিয়া এবং কাঠামোগত বৈষম্যের কারণে জনসংখ্যার একটি বড় অংশ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ সামাজিক গতিশীলতা, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, গবেষণা ও নাগরিকদের বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ওপর প্রভাব ফেলে। উচ্চশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হলে পুরো সমাজই তার উন্নয়নের সম্ভাবনা হারায়।

বর্তমান মডেলের মূল সমস্যাটি হলো উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অভিজাততন্ত্র এবং সীমিত সুযোগের সহাবস্থান। এর কারণ নিহিত রয়েছে এমন সব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোয়, যা আর্থিক সামর্থ্য, ভৌগোলিক অবস্থান, অত্যধিক বাছাই-প্রক্রিয়া এবং নানা প্রাতিষ্ঠানিক বাধার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ও সেখানে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হওয়ার কথা জ্ঞান ও সামাজিক গতিশীলতা সম্প্রসারণ করা, তা শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান বৈষম্যকেই পুনরুৎপাদন করে। এর ফলে শিক্ষার সুযোগ কেবল সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর মধ্যেই কুক্ষিগত থাকে; সামাজিক বৈষম্য স্থায়ী হয় এবং এমন সব প্রতিভার অপচয় ঘটে যারা বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারত।

এই ব্যবস্থার মাশুল গুনতে হয় উচ্চ মেধা ও সম্ভাবনাময় তরুণদের, যাদের যাতায়াত, আবাসন, পড়াশোনার উপকরণ বা মানসম্মত প্রতিষ্ঠানে পড়ার মতো আর্থিক সামর্থ্য নেই। এর ভুক্তভোগী প্রান্তিক অঞ্চলের মানুষও—বড় বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রগুলো থেকে দূরে থাকায় সেখানে অনেক সময় প্রতিভার বিকাশের কোনো সুযোগই তৈরি হয় না। এর ফলে সম্ভাবনাময় জীবনের গতিপথ রুদ্ধ হয়, প্রজন্মের পর প্রজন্ম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বৈষম্যের চক্র চলতেই থাকে। অর্থনৈতিক বা কাঠামোগত বাধার মাধ্যমে সমাজ যখন উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ করে, তখন তা কেবল ব্যক্তিকেই বঞ্চিত করে না, বরং

সমাজ নিজেকেই সীমাবদ্ধ করে ফেলে। উচ্চতর জ্ঞানচর্চাকে সীমিত করে এমন কোনো ব্যবস্থা নিজের বুদ্ধিবৃত্তিক নবায়ন, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এবং জটিল সংকট মোকাবিলার সক্ষমতা কমিয়ে ফেলে। এই কাঠামো থেকে যারা লাভবান হয়, তারা হলো সেই গোষ্ঠী যারা সাংস্কৃতিক পুঁজি ও প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার কেন্দ্রীভবন এবং জ্ঞানকে সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের হাতিয়ার হিসেবে টিকিয়ে রাখার সুবিধা ভোগ করে। অভিজাততান্ত্রিক হয়ে পড়লে বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তির হাতিয়ার না হয়ে বরং বিশেষ সুবিধা বা 'প্রিভিলেজ'কে পুনরুৎপাদন করার যন্ত্রে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে। এই প্রয়োজনীয় রূপান্তরের মূল ভিত্তি হলো উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং জ্ঞানের আদান-প্রদান ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা। এর জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক বাধা কার্যকরভাবে কমিয়ে আনা, বৃত্তির সুযোগ বৃদ্ধি, সরকারি অর্থায়নের নিশ্চয়তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটরিচ বা সম্প্রসারণমূলক কর্মসূচি এবং উচ্চমানের ডিজিটাল হাব বা কেন্দ্রগুলোর প্রসার ঘটানো। এই প্রস্তাবনায় এমন সব উন্মুক্ত, সশরীরে ও ডিজিটাল মডেল গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে, যার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জিত জ্ঞান ব্যাপকভাবে, সহজলভ্যভাবে এবং সহযোগিতামূলক উপায়ে ছড়িয়ে পড়ে। এর অর্থ হলো—শিক্ষায়তনিক বিষয়বস্তুর অবাধ সৃষ্টি ও আদান-প্রদান, উন্মুক্ত ডিজিটাল লাইব্রেরি, উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারি প্ল্যাটফর্ম, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌথ গবেষণা এবং বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার বৈশ্বিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা। বিশ্ববিদ্যালয়ে উৎপাদিত জ্ঞানকে কেবল প্রাতিষ্ঠানিক গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তা অবশ্যই সামাজিক সম্পদে পরিণত করতে হবে।

শুধুমাত্র বিনামূল্যে পড়াশোনার সুযোগ নয়, এর মূল ধারণাটি হলো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার কাঠামোগত গণতন্ত্রীকরণ। এর অর্থ হলো কেবল ভর্তির আনুষ্ঠানিক সুযোগ নিশ্চিত করা নয়, বরং শিক্ষার্থীদের টিকে থাকার উপযুক্ত পরিবেশ, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সহায়তা, প্রযুক্তিগত অবকাঠামো এবং শিক্ষাদান, গবেষণা ও সমাজ-সম্পৃক্ত কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা। বিশ্ববিদ্যালয়কে সমাজের সাথে সংলাপে যুক্ত হতে হবে, জ্ঞানের বিচিত্র রূপকে গ্রহণ করতে হবে এবং সামাজিক পরিবর্তনের একটি সক্রিয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে হবে।

পরিবর্তনের পথে বাধা আসবে সেইসব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থেকে, যারা বাছাই বা নির্বাচনের প্রক্রিয়াকে মর্যাদা, বিশিষ্টতা এবং সামাজিক পুঁজি পুনরুৎপাদনের প্রতীক

হিসেবে গণ্য করতে অভ্যস্ত। এটি কেবল ভর্তির সুযোগের ক্ষেত্রেই নয়, বরং এমন সব সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতীকী প্রতিবন্ধকতা বজায় রাখার মাধ্যমেও প্রকাশ পায় যা উচ্চশিক্ষাকে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীর পরিচায়ক করে তোলে। তখন বিশ্ববিদ্যালয় আর বুদ্ধিবৃত্তিক মুক্তির স্থান থাকে না; বরং তা সামাজিক বৈধতা অর্জনের একটি যন্ত্র হিসেবে কাজ করতে শুরু করে—যা বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক নেটওয়ার্ক, সুযোগের কেন্দ্রীভবন এবং জ্ঞানের সীমিত প্রবাহকে টিকিয়ে রাখে। বাস্তবে যা অন্তর্ভুক্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে, সেই 'এক্সক্লুসিভিটি' বা বিশেষ গোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার রক্ষার বিষয়টিকে তখন 'উৎকর্ষ' বা শ্রেষ্ঠত্বের সমার্থক হিসেবে তুলে ধরা হয়।

এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি শুরু হতে হবে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের মাধ্যমে—যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, বৃত্তি প্রদান, শিক্ষার্থীদের টিকে থাকার বিশেষ কর্মসূচি, সান্ধ্যকালীন ক্লাস, বিকেন্দ্রীভূত শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন। যখন জনসংখ্যার একটি বড় অংশ বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের জন্য একটি সম্ভাব্য ও সহজলভ্য স্থান হিসেবে দেখতে শুরু করবে, তখনই উচ্চতর জ্ঞান কেবল মুষ্টিমেয় মানুষের সম্পদ—এই ঐতিহাসিক ধারণাটি ভেঙে পড়বে। দ্বিতীয় ধাপটি সম্পন্ন হতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কাঠামোর ভেতরে। এর অর্থ হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে ক্রমশ গণতান্ত্রিক করা এবং বিভিন্ন কাউন্সিল, বোর্ড ও কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মী ও সমাজের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। বাজেট সংক্রান্ত স্বচ্ছতা, নেতৃত্বের উন্মুক্ত নির্বাচন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম জোরদার করা এবং ভর্তি ও টিকে থাকার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বর্জনমূলক বা বৈষম্যমূলক শর্তাবলি পর্যালোচনা করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে আর কেবল নিজের গণ্ডিতে আবদ্ধ না রেখে উন্মুক্ত করে তোলা সম্ভব।

এরপর, বিশ্ববিদ্যালয়কে সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে একীভূত করা অত্যন্ত জরুরি। সামাজিক চাহিদাকে এমন সব সরকারি নীতিতে রূপান্তর করতে হবে যা শিক্ষাদান, গবেষণা ও সমাজ-সম্পৃক্ত কার্যক্রমকে জনগণের প্রকৃত প্রয়োজনের সাথে যুক্ত করে—যেমন স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, আঞ্চলিক উন্নয়ন, সংস্কৃতি, টেকসই উন্নয়ন এবং সামাজিক উদ্ভাবন। প্রতিটি নতুন অগ্রগতি বিশ্ববিদ্যালয় ও দৈনন্দিন জীবনের মধ্যকার দূরত্ব কমিয়ে আনবে এবং উচ্চশিক্ষাকে ক্ষমতায়নের একটি গণ-অবকাঠামোয় পরিণত

করবে। যে সমাজ একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ, সার্বভৌমত্ব ও ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করে, তাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি প্রকৃত অর্থে অবাধ, সহজলভ্য এবং সামাজিকভাবে একীভূত স্থানে পরিণত করতে হবে। অবৈতনিক বা বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দক্ষ পেশাজীবী গড়ে তোলার পরিধি বাড়ায়, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনকে শক্তিশালী করে এবং বৃহত্তর সামাজিক গতিশীলতা বা সামাজিক সোপানে উত্তরণের সুযোগ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক পটভূমির সমন্বয় ঘটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের জ্ঞানচর্চাকে আরও বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিভঙ্গিতে সমৃদ্ধ করে, যা সমাজের প্রকৃত চাহিদার অধিকতর কাছাকাছি। এর ফলে গড়ে ওঠে এক গতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ, যা সামগ্রিক উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করা মানেই হলো মানবজাতির নিজস্ব ভবিষ্যতের প্রসারকে সমুন্নত রাখা। কৃত্রিম বাধার বেড়াজালে উচ্চশিক্ষা আবদ্ধ থাকলে কোনো সমাজই তার পূর্ণ সম্ভাবনায় পৌঁছাতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিকীকরণের অর্থ কেবল শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ নয়, বরং এর লক্ষ্য হলো আজ প্রান্তিক অবস্থায় থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষের সুপ্ত মেধা ও রূপান্তরের শক্তিকে উন্মুক্ত করে দেওয়া। জ্ঞান যখন মুক্ত থাকে, তখন তা কেবল গুটিকতক মানুষের সেবায় সীমাবদ্ধ না থেকে সকলের ভাগ্য গঠনে ভূমিকা রাখতে শুরু করে।

তৃতীয় খণ্ড — সম্পদ পুনর্বণ্টন ব্যবস্থা

১৪. কর ব্যবস্থা

যেসব জনগোষ্ঠীর বিনিয়োগের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তারাই কেন বিনিময়ে সবচেয়ে কম সুবিধা পায়? কর ব্যবস্থার কাজ কেবল রাজস্ব সংগ্রহ করা নয়, বরং বৈষম্য দূর করা, জনকল্যাণমূলক কাজের অর্থায়ন করা এবং প্রতিটি জনগোষ্ঠীকে—তাদের প্রাথমিক সম্পদের পরিমাণ যা-ই হোক না কেন—উন্নয়নের জন্য মর্যাদাপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা। একটি সুষ্ঠু মডেলের জন্য প্রয়োজন প্রশাসনিক নৈকট্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি-ভিত্তিক সম্পদ পুনর্বণ্টনের সমন্বয়।

বর্তমান ব্যবস্থায়, কর কাঠামো সম্পদকে কেন্দ্রীয় কাঠামোর অধীনে কেন্দ্রীভূত করে এবং তা অত্যন্ত ধীরগতিতে ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মাধ্যমে পুনর্বণ্টন করে, যা স্থানীয় প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আবার, সম্পূর্ণ স্থানীয়-কেন্দ্রিক মডেলের ক্ষেত্রেও গুরুতর সীমাবদ্ধতা রয়েছে; কারণ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অঞ্চলগুলোর রাজস্ব সংগ্রহের সক্ষমতা কম থাকে এবং ফলে তারা প্রয়োজনীয় সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। এই আলোচনার মূল তাৎপর্য হলো ব্যবস্থাপনাগত স্বায়ত্তশাসন এবং বণ্টনমূলক ন্যায়বিচারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা, যাতে স্থানীয় পর্যায়ের কার্যক্রম কোনোভাবেই আর্থিক বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত না হয়।

বর্তমান মডেলের সমস্যাটি মূলত দুটি ত্রুটির মধ্যে নিহিত: অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ এবং আঞ্চলিক বৈষম্য বৃদ্ধি। এর কারণ হলো এমন সব কর ব্যবস্থা যা একদিকে রাজস্ব সংগ্রহ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে জনগোষ্ঠীর বাস্তব পরিস্থিতি থেকে অনেক দূরের কোনো কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত করে; আবার অন্যদিকে, স্থানীয় সম্পদের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হলে তা বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যকার ঐতিহাসিক বৈষম্যকে জিইয়ে রাখে। এর ফলাফল অত্যন্ত নেতিবাচক: উন্নত অঞ্চলগুলো আরও বেশি অবকাঠামো, সেবা ও বিনিয়োগ সক্ষমতা অর্জন করতে থাকে, অথচ সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলগুলো নির্ভরতা, কাঠামোগত ঘাটতি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির সীমিত সুযোগের এক স্থায়ী চক্রে আটকা পড়ে। এর প্রত্যক্ষ পরিণতি হলো ঐতিহাসিক বৈষম্যের পুনরাবৃত্তি এবং একটি খণ্ডিত সামাজিক কাঠামোর সুদৃঢ়করণ, যেখানে সম্পদ ও দারিদ্র্য ভৌগোলিকভাবে প্রায় বংশানুক্রমিক ধারায় বণ্টিত হয়।

বর্তমান মডেলের বৈষম্য প্রান্তিক অঞ্চল, ছোট শহর এবং ঐতিহাসিকভাবে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর বাস্তব জীবনে স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। যেসব পরিবার জরাজীর্ণ স্কুল, অপর্যাপ্ত হাসপাতাল, সীমিত যাতায়াত ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধার অভাব এবং সীমিত অর্থনৈতিক সুযোগের মধ্যে জীবনযাপন করে, তাদেরই এর চড়া মূল্য দিতে হয়। যেখানে কিছু কেন্দ্র ক্রমাগত বিনিয়োগের সুবিধা পায়, সেখানে অন্যান্য অঞ্চল দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতির মধ্যে পড়ে থাকে। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হলো—গড় আয়ু কমে যাওয়া, শিক্ষার সুযোগ সীমিত হওয়া, সামাজিক ঝুঁকির মুখে পড়া এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দারিদ্র্য বজায় থাকা। যারা এই মডেল বজায় রেখে লাভবান হয়, তারা হলো প্রধান রাজস্ব-উৎপাদনকারী কেন্দ্রগুলোতে অবস্থানরত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভিজাত শ্রেণি

এবং সেই কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো যা সম্পদ বণ্টনের ক্ষমতা নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখে। এই প্রেক্ষাপটে, উপযুক্ত প্রস্তাবটি হলো এমন একটি কর ব্যবস্থা যেখানে ব্যবস্থাপনা বিকেন্দ্রীভূত এবং সম্পদের কেন্দ্রীয় পুনর্বণ্টন প্রক্রিয়াটি সহযোগিতামূলক। সংগৃহীত রাজস্ব একটি জাতীয় কাঠামোর আওতায় পরিচালিত সাধারণ তহবিলে জমা হওয়া উচিত; এই তহবিলটি প্রতিটি সম্প্রদায়ের প্রকৃত প্রয়োজন—যেমন জনসংখ্যা, সামাজিক সূচক, ঐতিহাসিক বঞ্চনা, বিদ্যমান অবকাঠামো এবং আঞ্চলিক জরুরি প্রয়োজনীয়তা—বিবেচনা করে আনুপাতিক হারে সম্পদ পুনর্বণ্টন করতে সক্ষম হবে। এর ফলে কেন্দ্র নিজের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত না করে বরং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি সমন্বয় করবে এবং বন্টনমূলক ন্যায়বিচার ও দীর্ঘদিনের জমে থাকা বৈষম্য দূরীকরণের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

প্রথম ধাপটি হলো একটি 'কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক সমতা বিধান তহবিল' (Central Territorial Equalization Fund) গঠন করা, যার সম্পদ পুনর্বণ্টনের নিয়মাবলী হবে সর্বজনীন, স্বচ্ছ এবং নিরীক্ষাযোগ্য। জাতীয় কর রাজস্বের সিংহভাগ—বিশেষ করে আয়, সম্পদ, বিপুল বিত্ত, আর্থিক মুনাফা এবং উচ্চ অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভূত কার্যক্রমের ওপর আরোপিত কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ—এই তহবিলে জমা হওয়া উচিত। দ্বিতীয় ধাপটি হলো বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার বিকেন্দ্রীকরণ: পুনর্বণ্টনকৃত সম্পদের ব্যবহার বা বাস্তবায়ন স্থানীয় পরিষদ ও আঞ্চলিক প্রশাসনের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে, যাদের কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসন থাকবে এবং যাদের কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট সামাজিক উন্নয়ন লক্ষ্যের সাথে যুক্ত থাকবে। প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ হলো—স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো, আবাসন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মতো খাতগুলোতে সম্পদ বরাদ্দের বিষয়ে স্থানীয় এলাকা, পৌরসভা ও অঞ্চলগুলো সরাসরি সিদ্ধান্ত নেবে; তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি কঠোর জনস্বচ্ছতা ও সামাজিক তদারকির ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত হবে। এর ফলে স্থানীয় সরকার কেবল কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বাস্তবায়নের নিষ্ক্রিয় মাধ্যম হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সত্তায় পরিণত হবে, অথচ একই সাথে তাদের কেবল নিজস্ব রাজস্ব সংগ্রহের সক্ষমতার ওপরই নির্ভর করে থাকতে হবে না।

এটি স্পষ্ট যে এই মডেলটি প্রভাবশালী মহলের বা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা গোষ্ঠীর প্রতিরোধের মুখে পড়বে। সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখা অর্থনৈতিক গোষ্ঠী, সিদ্ধান্ত গ্রহণের একচ্ছত্র অধিকারে অভ্যস্ত কেন্দ্রীয় প্রশাসন এবং ঐতিহাসিকভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত

অঞ্চল—যারা সম্পদ পুনর্বণ্টনকে নিজেদের সুবিধা হারানোর বিষয় হিসেবে দেখবে—তাদের কাছ থেকে বিরোধিতা আসবে। এই প্রতিরোধ শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক চাপ, সংস্কার-বিরোধী প্রচারণার অর্থায়ন, অর্থনৈতিক অকার্যকারিতার যুক্তি এবং প্রাতিষ্ঠানিক বাধার (বিশেষ করে বাজেট নিয়ন্ত্রণকারী আইনি ও প্রশাসনিক সংস্থাগুলোতে) রূপ নেবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজস্ব পুনর্বণ্টনকে স্থিতিশীলতা, আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা বা অর্থনৈতিক অংশীজনদের আস্থার জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরা হবে; অথচ বাস্তবে এর মূল উদ্দেশ্য হলো রাজস্ব সংগ্রহ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ঐতিহাসিক বৈষম্য বজায় রাখা।

সংস্কার প্রক্রিয়া কর ব্যবস্থায় কোনো আকস্মিক পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করতে পারে না; বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কারিগরি ও রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট ধীরগতির ও ধারাবাহিক অংশগ্রহণের ওপর এটি নির্ভরশীল। প্রথমত, সংগৃহীত সম্পদের উৎস, কেন্দ্রীভূত অবস্থান এবং ব্যবহারের গন্তব্য সম্পর্কে জনসমক্ষে স্বচ্ছতা বাড়াতে হবে। যখন বৃহত্তর জনগোষ্ঠী সুনির্দিষ্টভাবে বুঝতে পারবে কারা আনুপাতিক হারে বেশি অবদান রাখছে, কোন অঞ্চলে বিনিয়োগ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং বর্তমান বণ্টন ব্যবস্থা কীভাবে কাঠামোগত বৈষম্যকে আরও জোরদার করছে, তখনই সংস্কারের পক্ষে জনসমর্থন বা বৈধতা তৈরি হবে। রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়গুলো কেবল বিশেষজ্ঞদের আলোচনার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে একে দৈনন্দিন জন-আলোচনার অংশ করে তুলতে হবে।

এরপর প্রয়োজন প্রগতিশীল এবং অঞ্চল-ভিত্তিক বা ভৌগোলিক ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কার। পশ্চাৎমুখী বা বৈষম্যমূলক প্রণোদনা পর্যালোচনা, আয় ও সম্পদের ওপর প্রগতিশীল করহার প্রয়োগ, কর-রাজস্বের আংশিক পুনর্বণ্টন এবং স্থানীয় বাজেটের সক্ষমতা বৃদ্ধি—এসব পদক্ষেপ কোনো আকস্মিক বিপর্যয় ছাড়াই সংস্কারের কার্যকারিতা প্রমাণ করতে পারে। প্রতিটি পদক্ষেপের লক্ষ্য হওয়া উচিত পৌরসভা, স্থানীয় সম্প্রদায় ও অঞ্চলগুলোর আর্থিক স্বায়ত্তশাসন বৃদ্ধি করা, এবং একই সাথে এমন জাতীয় সমন্বয় ব্যবস্থা বজায় রাখা যা চরম ভারসাম্যহীনতা রোধে সক্ষম। জনগণের চাপকে বিকেন্দ্রীভূত রাজস্ব পরিষদ, আঞ্চলিক অংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রণয়ন, রাজস্ব বণ্টনের স্পষ্ট নিয়ম এবং নাগরিকদের দ্বারা স্থায়ী নিরীক্ষা ব্যবস্থার রূপ দিতে হবে। প্রতিটি নতুন অগ্রগতি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রীভূত প্রবণতা কমাবে এবং নিজ নিজ অঞ্চলের প্রয়োজন মেটানোর সক্ষমতা বাড়াবে। বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে হতে হবে ক্রমপুঞ্জীভূত

বা ধারাবাহিক: দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও বৈধতার ক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে অর্জিত প্রতিটি সাফল্য পুনর্বণ্টন প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপকে আরও শক্তিশালী করবে। কোনো অর্থনীতিই দীর্ঘমেয়াদী সংহতি ও ভবিষ্যৎ ধরে রাখতে পারে না যদি সরকারি রাজস্ব মূলত ঐতিহাসিক বিশেষ সুবিধাগুলো রক্ষার কাজেই ব্যবহৃত হয়। কর ব্যবস্থাকে পরোক্ষভাবে সম্পদ কেন্দ্রীভূত করার হাতিয়ার হওয়া থেকে সরে এসে ভারসাম্য, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং জনকল্যাণ নিশ্চিত করার একটি কাঠামো হিসেবে কাজ শুরু করতে হবে। এর মূল কৌশল হলো কর প্রবাহ এবং পুনর্বণ্টনের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে চরম স্বচ্ছতা বজায় রাখা, যাতে বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখানো যায় যে সম্পদ কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সময়ের সাথে সাথে কোন কোন মানবিক সূচকের উন্নতি ঘটছে। নাগরিক রাজস্ব পরিষদ, স্বাধীন নিরীক্ষা এবং রিয়েল-টাইম বা তাৎক্ষণিক তথ্যভিত্তিক গণ-পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণকে জোরদার করতে হবে। একটি ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হলো সেটিই, যেখানে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা কুক্ষিগত করা বন্ধ করে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে; যেখানে স্থানীয় অঞ্চলগুলো তাদের অতীতের সম্পদ বা বিত্তের সীমাবদ্ধতায় আটকা না পড়ে নিজস্ব কণ্ঠস্বর তুলে ধরার সুযোগ পায়; এবং যেখানে করব্যবস্থা কেবল বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার হাতিয়ার না হয়ে সামাজিক সংহতি সাধনের একটি কার্যকর ও বাস্তবসম্মত উপায়ে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার বাজারের স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে না, বরং তা অর্জিত হয় সম্পদ, ক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা পুনর্বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সাহসিকতা প্রদর্শনের মাধ্যমে। এর ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীগুলো সীমিত সম্পদের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে উন্নয়নের এক সংহতিমূলক নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে পারে, যেখানে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী অঞ্চলগুলো সবার জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় অবদান রাখে। একই সাথে, বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণের ফলে প্রতিটি সম্প্রদায় তাদের প্রকৃত প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ পায়, যা কর্মদক্ষতা, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক বৈধতা বৃদ্ধি করে। এর চূড়ান্ত ফলাফল হিসেবে এমন একটি মডেল গড়ে ওঠে যা প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসনের সাথে সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টনের সমন্বয় ঘটায়। একটি সুষ্ঠু করব্যবস্থা কেবল তাদেরই পুরস্কৃত করতে পারে না যাদের ইতিমধ্যে প্রচুর সম্পদ রয়েছে; বরং এর সর্বোচ্চ লক্ষ্য হলো ঐতিহাসিক বৈষম্যকে একটি যৌথ ও সুন্দর ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় রূপান্তর করা।

১৫. মেধা ও কাঠামোগত ন্যায়বিচার

সমাজকে শুরু থেকেই এক অসম প্রতিযোগিতার ময়দানে পরিণত না করে কীভাবে আমরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিতে পারি? সামাজিক ন্যায়বিচার এবং মেধার মূল্যায়নের মধ্যকার এই টানাপড়েন থেকেই মূলত বিষয়টি উঠে আসে। একদিকে, অবদান, নিষ্ঠা ও উদ্ভাবনী শক্তির স্বীকৃতি পাওয়াটা যৌক্তিক। অন্যদিকে, শুরুর পরিস্থিতি বা প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করে কেবল ফলাফলকে গুরুত্ব দেয় এমন কোনো ব্যবস্থা বৈষম্যকে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। আসল চ্যালেঞ্জ হলো এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা একই সাথে সুযোগের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করবে এবং শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে উৎসাহ জোগাবে।

আজকাল মেধাভিত্তিক ব্যবস্থাকে (মেরিটক্রেসি) ন্যায়বিচারের একটি নীতি হিসেবে তুলে ধরা হয়: যারা কঠোর পরিশ্রম করে, তারাই এগিয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে এই ধারণাটি নৈতিকভাবে অকাট্য মনে হতে পারে। কিন্তু সামাজিক বাস্তবতা এক গভীর বৈপরীত্যের চিত্র তুলে ধরে। সব ব্যক্তি একই অবস্থান থেকে যাত্রা শুরু করে না। শিক্ষা, পারিবারিক আয়, প্রযুক্তির সুবিধা, স্বাস্থ্যসেবা, সময়ের প্রাপ্যতা, মানসিক স্থিতিশীলতা এবং সহায়তাকারী সামাজিক যোগাযোগ—এসব বিষয় অত্যন্ত অসম ভিত্তির সৃষ্টি করে। সামাজিক গতিশীলতা, অর্থনৈতিক প্রণোদনা এবং সম্প্রদায়ের সংহতির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলার কারণেই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যখন জন্মগত বা প্রারম্ভিক বৈষম্য বিবেচনা না করে মেধার মূল্যায়ন করা হয়, তখন ব্যবস্থাটি প্রকৃত অবদানকে পুরস্কৃত করতে ব্যর্থ হয়; বরং বংশগত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সুবিধাকেই পুরস্কৃত করে।

বর্তমান মডেলটির মূল সমস্যা নিহিত রয়েছে এর বয়ান ও বাস্তবতার মধ্যকার বৈপরীত্যে। এর কারণ হলো এমন সব মেধার মানদণ্ড গ্রহণ করা, যা প্রারম্ভিক কাঠামোগত পরিস্থিতির সাথে বিচ্ছিন্ন। এর ফলে ন্যায়বিচারের মোড়কে বিশেষ সুবিধা বা 'প্রিভিলেজ'-এরই পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। এর চূড়ান্ত পরিণতি হলো বৈষম্য বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থার সংকট। প্রথাগত মেধাভিত্তিক ব্যবস্থা সামাজিক উত্তরণ বা অগ্রগতির পথ সুগম করার পরিবর্তে প্রায়শই বিদ্যমান ব্যবধানকে বৈধতা দেয় এবং ঐতিহাসিক সুবিধাকে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

এর মাশুল তাদেরই দিতে হয়—যাদের প্রতিভা, শৃঙ্খলাবোধ ও কাজের প্রতি নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও সমান শর্তে প্রতিযোগিতা করার মতো ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নেই। মানসম্মত শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত মেধাবী শিক্ষার্থী, পরিচিত মহলের (নেটওয়ার্ক) অভাব থাকা দক্ষ কর্মী, প্রাথমিক পুঁজিহীন উদ্যোক্তা এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোবিহীন সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে। সামাজিক ভোগান্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ পায় সমষ্টিগত হতাশা, সামাজিক গতিশীলতার স্থবিরতা এবং এমন এক ক্রমবর্ধমান ধারণার মধ্য দিয়ে যে, এই ব্যবস্থা প্রচেষ্টাকে নয়, বরং জন্মগত অবস্থানকেই পুরস্কৃত করে।

এই কাঠামো থেকে তারাই লাভবান হয় যারা আগে থেকেই সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে; তাদের অর্জিত সুবিধাগুলো নির্বাচন ও পুরস্কার প্রদানের আপাত-নিরপেক্ষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমাগত পুনরুৎপাদিত হতে থাকে। অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অধিকারী অভিজাতরা এই বয়ান বা আখ্যানটি টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে লাভবান হয়, কারণ এটি বৈষম্যের অস্তিত্বকে নৈতিক বৈধতা প্রদান করে। উত্তরাধিকারলব্ধ সুবিধাকে 'মেধা' বা যোগ্যতার রূপ দেওয়ার মাধ্যমে এই ব্যবস্থাটি নিজের অস্তিত্ব ও আধিপত্য বজায় রাখার প্রক্রিয়াকে সুরক্ষিত রাখে।

আমাদের এমন একটি নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে যা 'বণ্টনমূলক মুদ্রা' (distributive currencies) এবং প্রেক্ষাপট-নির্ভর মেধা ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এর মূল প্রস্তাবনা হলো—প্রচেষ্টা, উৎকর্ষ এবং অবদানের জন্য প্রণোদনা ব্যবস্থা বাতিল করা নয়, বরং সেগুলোকে ন্যায্য ভিত্তির ওপর পুনর্গঠন করা। বাস্তবায়নের প্রথম ধাপে এমন সব 'প্রেক্ষাপট-ভিত্তিক মেধা সূচক' তৈরি করতে হবে, যা শুরুর অবস্থান, সম্মুখীন হওয়া প্রতিবন্ধকতা, অবদানের সামাজিক প্রভাব এবং ব্যক্তির প্রকৃত অগ্রগতির বিষয়গুলোকে বিবেচনায় নিতে সক্ষম। অর্থনৈতিক পরিভাষায়, বণ্টনমূলক মুদ্রার প্রস্তাবনাটির লক্ষ্য হলো এমন সব আর্থিক মাধ্যম বা হাতিয়ার তৈরি করা যা প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থাকে পরিপূরক হিসেবে সহায়তা করবে এবং কার্যকর সামাজিক অবদানকে মূল্যায়নের দিকে মনোনিবেশ করবে। এই মুদ্রাগুলো স্থানীয় সম্প্রদায়, অঞ্চল বা জাতীয় পর্যায়ে চালু করা যেতে পারে। উচ্চ সমষ্টিগত মূল্যমানসম্পন্ন কর্মকাণ্ডে—যেমন শিক্ষা, সম্প্রদায়ের সেবা, সামাজিক উদ্ভাবন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উৎপাদন, পরিবেশ পুনরুদ্ধার এবং স্থানীয় অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ—অংশগ্রহণের স্বীকৃতিস্বরূপ এগুলো

প্রদান করা হবে। কেবল সম্পদ সঞ্চয়কারী মুদ্রার বিপরীতে, বণ্টনমূলক মুদ্রার কাজ হলো সম্পদ পুনর্বণ্টন করা এবং ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ঘটানো।

এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন হওয়া উচিত। প্রথম ধাপটি হবে একটি পরীক্ষামূলক বা 'পাইলট' কার্যক্রম, যা নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায় বা শহরে প্রয়োগ করা হবে এবং এতে স্থানীয় পরিষদ, ডিজিটাল নিবন্ধন প্ল্যাটফর্ম ও সরকারি নিরীক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটানো হবে। দ্বিতীয় ধাপে এই ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করা হবে, যার আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তৃতীয় ধাপে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত 'পুনর্বণ্টনমূলক কর ব্যবস্থা'-র সাথে এর সমন্বয় সুদৃঢ় করা হবে; এর ফলে প্রকৃত সামাজিক মেধা বা যোগ্যতার ভিত্তিতে ঋণ সুবিধা, উচ্চতর প্রশিক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৃহত্তর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

ক্ষমতাধর গোষ্ঠীগুলো এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। যারা বর্তমানের 'মেধাভিত্তিক' (meritocratic) বয়ান থেকে লাভবান হয়—বিশেষ করে যারা কেবল ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থানকে বৈধতা দেয়—তাদের কাছ থেকে এই বিরোধিতা আসবে। এই প্রতিরোধ প্রায়শই এমন সব আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ পায় যা ঐতিহাসিক বৈষম্যকে কঠোর পরিশ্রম, মেধা বা শৃঙ্খলার স্বাভাবিক ফলাফল হিসেবে তুলে ধরে; অথচ এতে জন্মগত পটভূমি, সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্যতা এবং জীবনযাত্রার সুযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান গভীর বৈষম্যকে উপেক্ষা করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে, মেধার পক্ষে সাফাই গাওয়াটা আর কেবল সক্ষমতার স্বীকৃতি থাকে না, বরং তা অর্জিত বিশেষ সুবিধা বা 'প্রিভিলেজ' (privilege) ধরে রাখার একটি আদর্শিক হাতিয়ার হয়ে ওঠে। কাঠামোগত বৈষম্যকে উপেক্ষা করে এমন প্রথাগত বাছাই প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকেও প্রতিরোধ আসতে পারে। শিক্ষা ব্যবস্থা, নিয়োগ প্রক্রিয়া, পেশাগত উন্নতির মডেল এবং জনপ্রতিনিধিত্বের কাঠামো এমন সব বাছাই-পদ্ধতি বা 'ফিল্টার' তৈরি করে যা আপাতদৃষ্টিতে নিরপেক্ষ মনে হলেও আসলে তাদেরই সহায়তা করে যারা ঐতিহাসিকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে থেকে যাত্রা শুরু করেছে। এই ব্যবস্থা অসম ফলাফলকেই ন্যায়বিচারের প্রমাণ হিসেবে গণ্য করে, অথচ প্রায়শই তা যাত্র শুরুর সময়ের গভীর বৈষম্যকেই প্রতিফলিত করে।

প্রথম ধাপটি হলো—প্রকৃত মেধা এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধার মধ্যকার পার্থক্যটি সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাছে স্পষ্ট করে তোলা। এর জন্য প্রয়োজন সহজবোধ্য ভাষা, সহজলভ্য তথ্য-উপাত্ত এবং এমন সুনির্দিষ্ট উদাহরণ যা দেখাবে কীভাবে আয়, ভৌগোলিক অবস্থান, শিক্ষার সুযোগ, প্রভাবশালীদের সাথে যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক পুঁজি (cultural capital) একজন ব্যক্তির জীবনের গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বুঝতে পারে যে যাত্রা শুরুর অবস্থানই চূড়ান্ত ফলাফলকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে, তখন মেধা সম্পর্কে আরও ন্যায্য এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য একটি ধারণা গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হয়। দ্বিতীয় ধাপটি অবশ্যই সেইসব বাছাইকারী প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই সম্পন্ন হতে হবে। ভর্তির মানদণ্ড ও টিকে থাকার নীতিমালার পুনর্বিবেচনা, সক্ষমতা সমতাকরণের কর্মসূচি, সামাজিক কোটা, বাছাই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং প্রেক্ষাপট-ভিত্তিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন—এসব পদক্ষেপ সম্মিলিতভাবে ঐতিহাসিক সুবিধাগুলোর স্বয়ংক্রিয় পুনরুৎপাদন কমিয়ে আনে। প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি সেই বয়ানকে দুর্বল করে দেয় যা চরম বৈষম্যকে কেবল ব্যক্তিগত মেধার প্রতিফলন হিসেবে দাবি করে। জনমত বা চাপের প্রতিফলন ঘটাতে হবে আইনি, নীতিগত ও প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে; যাতে অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত ও রাজনৈতিক সুযোগ লাভের মানদণ্ডে 'বণ্টনমূলক ন্যায়বিচার' (distributive justice)-কে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আমাদের একটি বিমূর্ত মেধা-মডেল থেকে সরে এসে এমন এক 'প্রেক্ষাপট-নির্ভর মেধা-মডেল' (situated merit model) গ্রহণ করতে হবে, যা কাঠামোগত বিষয়গুলোকে উপেক্ষা না করেই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিতে সক্ষম। জন্মগত পটভূমির গভীর বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট অসমতাকে বৈধতা দিতে 'মেধা'র ভাষাকে ব্যবহার করে কোনো সমাজ নিজেকে ন্যায়পরায়ণ বলে দাবি করতে পারে না।

আমাদের এমন একটি ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে যেখানে মেধা আর বিশেষ সুবিধার আড়াল হয়ে থাকবে না, বরং তা প্রকৃত বাধা জয়, সমষ্টিগত অবদান এবং মানবিক অগ্রগতির স্বীকৃতি দেবে। সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকর্ষকে বিসর্জন দেওয়ার প্রয়োজন নেই; বরং একে জন্মগত পটভূমির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করাই জরুরি। প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধার অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টনের মাধ্যমে মৌলিক বৈষম্যগুলো দূর করার ফলে, মেধা তখন ব্যক্তিগত অবদানকে আরও যথার্থভাবে প্রতিফলিত করতে শুরু করে। এছাড়াও, বণ্টনমূলক মুদ্রা সবচেয়ে দুর্বলদের প্রতি সম্মিলিত দায়িত্ব বিসর্জন না দিয়েই প্রচেষ্টা ও উদ্ভাবনের জন্য প্রণোদনা জোরদার করে। এটি এমন একটি

অর্থনৈতিক পরিবেশ তৈরি করে যেখানে শ্রেষ্ঠত্ব ও সংহতি পরস্পরবিরোধী শক্তি না থেকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করতে শুরু করে। অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে যোগ্যতা ও ন্যায্যতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতার উপর। যে ব্যবস্থা প্রণোদনা না দিয়ে শুধু বণ্টন করে, তা স্থবির হয়ে যেতে পারে। যে ব্যবস্থা বৈষম্য দূর না করে শুধু ফলাফলের পুরস্কার দেয়, তা বিভেদকে আরও গভীর করে। যখন সমাজ এমন একটি কাঠামোর মধ্যে মানবিক প্রচেষ্টার মূল্যকে স্বীকৃতি দিতে সক্ষম হয় যা সকলের জন্য মর্যাদা ও সুযোগ নিশ্চিত করে, তখনই আশার জন্ম হয়।

১৬. আর্থিক ক্ষমতা এবং পুনর্বন্টন প্রক্রিয়া

কার সম্পদের ভাগ্য নির্ধারণ করা উচিত যা একটি সমাজকে টিকিয়ে রাখে: তাৎক্ষণিক স্বার্থ বা একটি দায়িত্বশীল দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি? এই থিমটি আমাদের জীবনে একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান দখল করে কারণ এটি তাদের সাথে ডিল করে যারা একটি সম্প্রদায়, কোম্পানি বা জাতির মধ্যে সম্পদ, বিনিয়োগ এবং বিতরণের প্রবাহ পরিচালনা করে। শুধু প্রযুক্তিগত অপারেটরদের চেয়েও বেশি, এই এজেন্টরা অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার তৈরিতে কৌশলগত খেলোয়াড় হয়ে ওঠে।

আজকের বিশ্বে, আর্থিক ব্যবস্থাপকরা সরাসরি পাবলিক বাজেট, উত্পাদনশীল বিনিয়োগ, ক্রেডিট, অবকাঠামো এবং মূলধন বরাদ্দ সম্পর্কে সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করে। তারা সংজ্ঞায়িত করে যে কোন সেক্টরগুলি বৃদ্ধি পায়, কোন সম্প্রদায়গুলি সম্পদ গ্রহণ করে এবং কোন প্রকল্পগুলি কার্যকর থাকে। একটি পাবলিক স্কেলে, আর্থিক ব্যবস্থাপনার মান স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন এবং নিরাপত্তার মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিকে প্রভাবিত করে। একটি ব্যক্তিগত স্কেলে, এটি চাকরি সৃষ্টি, উদ্ভাবন এবং অর্থনৈতিক স্থায়িত্বকে প্রভাবিত করে।

বর্তমান মডেলের সমস্যাটি আর্থিক কৌশল এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার মধ্যে বিচ্ছিন্নতার মধ্যে রয়েছে। কারণটি এমন কাঠামোর মধ্যে রয়েছে যা তাৎক্ষণিক মুনাফাকে অগ্রাধিকার দেয়, কেন্দ্রীভূত স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত যা স্বচ্ছ নয়, সংক্ষিপ্ত রিটার্ন চক্র এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর চাপ দ্বারা পরিচালিত। আমরা সম্পদের ভুল বন্টন, আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত

সংকটের মুখে কাঠামোগত ভঙ্গুরতার সম্মুখীন হই। চূড়ান্ত প্রভাব হল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত আস্থা হারানো এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যাওয়া।

যখন আর্থিক ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র স্বল্পমেয়াদী কাজ করে, তখন খরচ সমগ্র সমাজের উপর পড়ে। যারা এই মূল্য পরিশোধ করে তারা হল সেই জনসংখ্যা যারা অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা, সীমিত ঋণ, উচ্চ মুনাফা এবং কম সামাজিক উপযোগী খাতে কেন্দ্রীভূত বিনিয়োগ, সংকট মোকাবেলার জন্য কৌশলগত রিজার্ভের অনুপস্থিতিতে ভুগছে। আমরা যা দেখি তা হল পাবলিক নীতির অনিশ্চয়তা, কাঠামোগত প্রকল্পের বাধা এবং সমগ্র পরিবার ও সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক দুর্বলতা। অস্থিতিশীলতার সময়ে, প্রভাবগুলি আরও বেশি দৃশ্যমান হয়: বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি, উৎপাদনশীল সংকোচন এবং ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতা। এই মডেল থেকে যারা লাভবান তারা হল আর্থিক অভিজাত, বৃহৎ বিনিয়োগ গোষ্ঠী এবং কাঠামো যেগুলি অবিলম্বে রিটার্নের দিকে একচেটিয়াভাবে মূলধনের ত্বরিত প্রচলন থেকে উপকৃত হয়। এই যুক্তিটি সম্পদের কেন্দ্রীকরণ এবং স্বল্পমেয়াদী ব্যক্তিগত স্বার্থের অধীনস্থ জনসাধারণের পরিকল্পনাকে শক্তিশালী করে। ফলাফল হল একটি অর্থনীতি যা কিছু লোকের জন্য দক্ষ, কিন্তু অনেকের জন্য অস্থির।

একটি নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন যা আর্থিক ব্যবস্থাপকদের যৌথ ভারসাম্যের অভিভাবক হিসাবে স্থানান্তর করে। প্রস্তাবটি হল এই পেশাদারদের একটি বর্ধিত ভূমিকা অর্পণ করা, প্রযুক্তিগত দক্ষতা, সিদ্ধান্তমূলক স্বচ্ছতা এবং দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক উদ্দেশ্যগুলির প্রতি প্রতিশ্রুতির সমন্বয়। এটি কেবল সংখ্যা পরিচালনার বিষয়ে নয়, মানব উন্নয়ন, স্থায়িত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক স্থিতিশীলতার উপকরণ হিসাবে সম্পদ পরিচালনার বিষয়ে। এই নতুন মডেলের বাস্তবায়ন জনস্বার্থের বিশ্বস্ত ম্যান্ডেট তৈরির মাধ্যমে শুরু হওয়া উচিত। ব্যবহারিক পরিভাষায়, আর্থিক ব্যবস্থাপক যারা পাবলিক রিসোর্স, রিডিস্ট্রিবিউটিভ ফান্ড, স্ট্র্যাটেজিক রিজার্ভ এবং বৃহৎ সামাজিক ইনভেস্টমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টের সাথে কাজ করেন তাদের আইনত সমষ্টিগত প্রভাব লক্ষ্যে আবদ্ধ হওয়া উচিত, লাভের সূচক নয়। এই আদেশে বৈষম্য হ্রাস, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, উত্পাদনশীল উদ্ভাবন, স্থায়িত্ব এবং সংকট সুরক্ষার মতো ক্ষেত্রে স্পষ্ট উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। দ্বিতীয় পর্যায়ে কারিগরি বিশেষজ্ঞ, সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এবং স্থায়ী বহিরাগত নিরীক্ষার সমন্বয়ে স্বাধীন আর্থিক তদারকি বোর্ড তৈরি করা হয়। এই বোর্ডগুলি অর্থনৈতিক অভিজাতদের দ্বারা দখলের বিরুদ্ধে এবং কেন্দ্রীভূত স্বার্থ দ্বারা

চালিত সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে একটি বাধা হিসাবে কাজ করবে। সামাজিক, আঞ্চলিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক রিটার্নের স্বচ্ছ সূচক সহ সমস্ত কৌশলগত সম্পদ বরাদ্দ সর্বজনীনভাবে সনাক্ত করা উচিত।

আর্থিক ক্ষমতার অধিকারী অভিজাতরা এই মডেলের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। যেসব মহল সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে, কারিগরি জটিলতার আড়ালে কাজ করতে এবং বিশাল সম্পদের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত মুনাফা সর্বোচ্চ করতে অভ্যস্ত, তাদের কাছ থেকে সরাসরি বিরোধিতা আসবে। এই প্রতিরোধ একই সাথে বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ পাবে: প্রাতিষ্ঠানিক তদবির (লবিং), নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামোর ওপর প্রভাব বিস্তার, অর্থনৈতিক নীতিনির্ধারকদের ওপর চাপ সৃষ্টি, পদ্ধতিগত ঝুঁকি বিষয়ক বয়ান তৈরি এবং সরকারি খাতের অদক্ষতা নিয়ে বারবার আলোচনার মাধ্যমে জনমতকে প্রভাবিত করা। সম্পদ পুনর্বণ্টনের বিষয়টিকে বাজার-আস্থা, তারল্য এবং বিনিয়োগের জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরা হবে; অথচ বাস্তবে এর মূল উদ্দেশ্য হলো মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে সেই আর্থিক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ধরে রাখা, যা বহু মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। কারিগরি পরিভাষার ইচ্ছাকৃত জটিলতা, আর্থিক হাতিয়ারের অস্বচ্ছতা এবং তথ্যের কেন্দ্রীভবন—এসবের মাধ্যমেও প্রতিরোধ গড়ে তোলা হতে পারে, যা সাধারণ মানুষকে অর্থনৈতিক বিতর্ক থেকে দূরে রাখে। যখন কোনো ব্যবস্থা সরকারি সিদ্ধান্তগুলোকে সাধারণের নাগালের বাইরের বিষয়ে পরিণত করে, তখন তা জনগণের আপত্তি বা প্রশ্ন তোলার ক্ষমতা কমিয়ে দেয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিশেষ সুবিধা বা একচ্ছত্র অধিকার বজায় রাখার সুযোগ বাড়িয়ে দেয়। তাই ডিজিটাল স্বচ্ছতা, তাৎক্ষণিক জবাবদিহিতা এবং নাগরিক নিরীক্ষার জন্য শক্তিশালী কাঠামো গড়ে তোলা অপরিহার্য। আর্থিক প্রযুক্তি-বিশেষজ্ঞদের শাসন বা 'ফিন্যান্সিয়াল টেকনোক্রেসি' আর এমন কোনো দুর্বোধ্য ভাষা হিসেবে কাজ করতে পারবে না যা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে কুক্ষিগত করে রাখে। কারিগরি জ্ঞান অবশ্যই বজায় রাখতে হবে, তবে তাকে গণতান্ত্রিক বৈধতার কাঠামোর অধীনস্থ করতে হবে।

প্রথম পদক্ষেপটি হলো বিশাল আর্থিক প্রবাহ, প্রণোদনা, তহবিল, ঋণ কার্যক্রম এবং বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়ে জনস্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা। সম্পদের প্রবাহ কীভাবে ঘটে, কারা অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে এবং কোন খাতগুলো মুনাফা কুক্ষিগত করে—তা সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে তোলা প্রয়োজন। যখন জনগণ আর্থিক ক্ষমতা এবং

বাস্তব বৈষম্যের মধ্যকার সম্পর্কটি বুঝতে পারে, তখনই পরিবর্তনের জন্য একটি রাজনৈতিক ভিত্তি তৈরি হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপটি নিতে হবে নিয়ন্ত্রণমূলক ও রাজস্ব কাঠামোর ভেতরে। সরকারি তহবিলের সামাজিক নিরীক্ষা, ব্যাংকিং স্বচ্ছতার জন্য কঠোর নিয়মকানুন, বৈষম্যমূলক প্রণোদনা সীমিত করা, অস্বাভাবিক মুনাফার ওপর প্রগতিশীল কর আরোপ এবং সরকারি ও কমিউনিটি ব্যাংকগুলোকে শক্তিশালী করা—এসব প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করবে, যা ধীরে ধীরে কেন্দ্রীভূত পুঁজির অনিয়ন্ত্রিত স্বায়ত্তশাসন কমিয়ে আনবে। প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করতে হবে যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মানেই অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা নয়, বরং সম্পদের সমষ্টিগত ব্যবহারের যৌক্তিকীকরণ। সামাজিক চাপকে এমন সব ব্যবস্থায় রূপান্তর করতে হবে যার মধ্যে রয়েছে নাগরিকদের অংশগ্রহণে গঠিত অর্থনৈতিক পরিষদ, শক্তিশালী সংসদীয় তদারকি, স্বাধীন নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং সম্পদ পুনর্বণ্টনের স্থায়ী ব্যবস্থা। বিশাল পুঁজির ব্যবস্থাপনাকে আমাদের ক্রমশ আরও স্বচ্ছ, নিয়ন্ত্রণযোগ্য এবং জনকল্যাণমুখী করে তুলতে হবে। কোনো সমাজই তার গণতান্ত্রিক বৈধতা বজায় রাখতে পারে না যখন সুদূরপ্রসারী প্রভাবসম্পন্ন আর্থিক সিদ্ধান্তগুলো সামাজিক অংশগ্রহণের আওতার বাইরে রাখা হয় এবং সেগুলোকে কেবল ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যখন পুঁজি বিশেষ সুবিধা বা বিশেষাধিকার রক্ষার হাতিয়ার না হয়ে সমষ্টিগত স্থিতিশীলতা রক্ষার উপায়ে পরিণত হয়, তখন আর্থিক সম্পদ কেবল হিসাব-নিকাশের বিষয় বা অর্থের প্রবাহ হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা জীবন, মর্যাদা ও ভবিষ্যতের জন্য বাস্তব সম্ভাবনার আধার হয়ে ওঠে। সম্পদ ব্যবস্থাপকদের সামাজিক ভারসাম্যের রক্ষক হিসেবে নতুন ভূমিকায় অবতীর্ণ করা একটি প্রকৃত পুনর্বণ্টনমূলক অর্থনীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অন্যতম নির্ণায়ক পদক্ষেপ। সমষ্টিগত দায়বদ্ধতার দ্বারা পরিচালিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পূর্বাভাসযোগ্যতা বাড়ায় এবং কাঠামোগত অপচয় হ্রাস করে। সামাজিক ও আঞ্চলিক লক্ষ্যগুলোর সাথে আর্থিক সিদ্ধান্তকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার মাধ্যমে অধিকতর সুষম প্রবৃদ্ধি অর্জন, অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। তখন পুঁজি আর কেবল সম্পদ কুক্ষিগত করার হাতিয়ার থাকে না, বরং তা সামাজিক বিনির্মাণের একটি কার্যকর কৌশলে পরিণত হয়। আর্থিক ব্যবস্থাপকদের ভূমিকা হিসাবরক্ষণ বা গাণিতিক হিসাবের গণ্ডি ছাড়িয়ে সমষ্টিগত ভবিষ্যতের মূল কাঠামো বিনির্মাণের পর্যায়ে উন্নীত হয়। একটি স্থিতিশীল সমাজ কেবল সম্পদের ওপর নয়, বরং

সেই সম্পদ কীভাবে পরিচালিত হচ্ছে তার ওপরও নির্ভর করে। যখন আর্থিক ব্যবস্থাপনা জনকল্যাণ বা সমষ্টিগত মঙ্গলের দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন সম্পদকে দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধিতে রূপান্তর করা, বৈষম্য হ্রাস করা এবং অধিকতর মানবিক অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতি আশাকে সুদৃঢ় করার বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি হয়।

১৭. নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ার গণতান্ত্রিকীকরণ

যৌথ জীবনযাত্রাকে পরিচালিত করে এমন নিয়মকানুন কাদের প্রণয়ন করা উচিত—রাজনৈতিক ক্ষমতার জোর নাকি তাদের দক্ষতা, যারা সামাজিক বাস্তবতা গভীরভাবে বোঝেন? এই অধ্যায়ে জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট নিয়ম ও নির্দেশিকা প্রণয়নের পদ্ধতিতে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়েছে। আইন প্রণয়নকে ক্ষমতার লড়াইয়ের সাথে যুক্ত করার পরিবর্তে, এই প্রস্তাবে জ্ঞান, কারিগরি দক্ষতা এবং নৈতিক দায়িত্ববোধের কর্তৃত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বর্তমান ব্যবস্থায় আইন ও নিয়মকানুন প্রণয়নের প্রক্রিয়াটি দলীয় স্বার্থ, প্রভাব বিস্তারের দ্বন্দ্ব এবং অর্থনৈতিক চাপের দ্বারা প্রভাবিত। যদিও রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তবুও তা জন-অর্থায়ন, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, পরিবেশ এবং সামাজিক সংগঠনের মতো জটিল বিষয়গুলো মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি সক্ষমতায় রূপান্তরিত হয় না। ত্রুটিপূর্ণভাবে গঠিত আইন আইনি অনিশ্চয়তা ও প্রাতিষ্ঠানিক অদক্ষতা সৃষ্টি করে এবং জনগণের দৈনন্দিন জীবনে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

বর্তমান মডেলের সমস্যাটি নিহিত রয়েছে নীতি-নির্ধারণ বা নিয়ম প্রণয়ন এবং প্রকৃত বিশেষায়িত জ্ঞানের মধ্যকার ব্যবধানে। এর মূল কারণ হলো রাজনৈতিক দরকষাকষি, জোট টিকিয়ে রাখা, নির্বাচনী হিসাব-নিকাশ এবং প্রতিষ্ঠিত স্বার্থ রক্ষার দ্বারা চালিত আইনি সিদ্ধান্তের প্রাধান্য। নিয়ম প্রণয়নের বিষয়টি কারিগরি তথ্যের গভীর বিশ্লেষণের চেয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে প্রভাব বজায় রাখতে চাওয়া পক্ষগুলোর মধ্যকার দ্বন্দ্ব থেকেই বেশি উদ্ভূত হয়। এর ফলে এমন সব নিয়ম তৈরি হয় যা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর জটিলতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; এর ফলে অস্থিতিশীল ও পরস্পরবিরোধী আইনি ব্যবস্থা গড়ে ওঠে অথবা এমন ব্যবস্থা তৈরি হয় যা সমাজের বাস্তব প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম। যখন আইন জ্ঞান-ভিত্তিক হওয়ার চেয়ে দ্বন্দ্ব-প্রসূত হয়, তখন তার

বৈধতা ও কার্যকারিতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এর ফলে আমরা অদক্ষ পরিষেবা, নীতিগত সংঘাত, অত্যধিক বিচারিক হস্তক্ষেপ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সংকটে দ্রুত সাড়া প্রদানে প্রাতিষ্ঠানিক অক্ষমতা দেখতে পাই। এই মডেল থেকে যারা লাভবান হয় তারা হলো রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণি, লবিস্ট গোষ্ঠী এবং দলীয় কাঠামো—যারা কারিগরি প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতা এবং ক্ষমতার দরকষাকষির মাধ্যমে চালিত নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া থেকে সুবিধা পায়। বিশেষায়িত জ্ঞানের অভাব বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর স্বার্থের অনুকূলে আইন প্রণয়নের পথ প্রশস্ত করে; কারণ জটিল নিয়মকানুনগুলো অর্থনৈতিক খাত এবং অভ্যন্তরীণ জোটগুলোর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারের জন্য উর্বর ক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

এই প্রেক্ষাপটে, কোনো প্রকার জোর-জবরদস্তি ছাড়াই বিশেষজ্ঞ আইনপ্রণেতাদের দিয়ে আইন প্রণয়নের প্রস্তাবটি উঠে এসেছে। এর মূল ধারণা হলো, অর্থনীতি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, শিক্ষা, অবকাঠামো, প্রযুক্তি এবং নাগরিক অধিকারের মতো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অত্যন্ত যোগ্য পেশাজীবীদের দ্বারা নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হওয়া উচিত। তাঁরা কাজ করবেন বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা নিয়ে এবং দলীয় চাপ কিংবা রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের প্রথাগত পদ্ধতির কাছে সরাসরি নতিস্বীকার না করেই। এই বিশেষজ্ঞরা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নয়, বরং কারিগরি বৈধতা, সামাজিক সংলাপ এবং সমষ্টিগত স্বার্থের প্রতি দায়বদ্ধতার মাধ্যমে তাদের ভূমিকা পালন করেন। এই মডেলটির বাস্তবায়ন দুটি প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে হওয়া উচিত। প্রথম স্তরটি হলো 'খাতভিত্তিক আইনি-কারিগরি পর্ষদ' (Sectoral Legislative Technical Chambers) গঠন করা; এই পর্ষদগুলো গঠিত হবে এমন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে, যাদের নির্বাচন করা হবে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রমাণিত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা এবং জনসেবায় সততার ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে। এই পেশাজীবীদের দায়িত্বের মেয়াদ হবে সাময়িক এবং তাদের কাজের নিয়মিত মূল্যায়ন করা হবে; এছাড়া নীতিগত বা বিধিবদ্ধ প্রস্তাবনা তৈরির কারিগরি প্রক্রিয়ার মধ্যেই তাদের ভূমিকা সীমাবদ্ধ থাকবে। দ্বিতীয় স্তরটি গণতান্ত্রিক বৈধতাকে সমুন্নত ও শক্তিশালী করে: বিশেষজ্ঞদের তৈরি প্রতিটি প্রস্তাবনাকেই সুবিন্যস্ত জন-আলোচনা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে—যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে জনগণের সাথে পরামর্শ, কমিউনিটি বা স্থানীয় পর্যায়ে শুনানি, আঞ্চলিক পরিষদের অংশগ্রহণ এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পর্যালোচনা। এর উদ্দেশ্য গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকে বাতিল করা নয়, বরং সুবিন্যস্ত জ্ঞানের সমন্বয়ে তাকে আরও জোরদার করা। এর ফলে বিধিমালা বা প্রবিধানগুলো কেবল

রাজনৈতিক দরকষাকষির ফসল হিসেবে না থেকে কারিগরি দক্ষতা ও সামাজিক আলোচনার সমন্বিত ফলাফলে পরিণত হয়।

আইন প্রণয়নের ওপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে অভ্যস্ত দলীয় কাঠামো, নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় প্রভাব খাটিয়ে লাভবান হওয়া অর্থনৈতিক গোষ্ঠী এবং এমন সব রাজনৈতিক শক্তি—যাদের টিকে থাকা নির্ভর করে জোট গঠন ও মুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে থাকা এজেন্ডা বজায় রাখার ওপর—তাদের কাছ থেকে স্পষ্টতই বিরোধিতা আসবে। এই প্রতিরোধ সাধারণত বিভিন্ন পদ্ধতিগত বাধা সৃষ্টি, কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগ, শাসনক্ষমতা বা পরিচালনা-যোগ্যতা (governability) বিষয়ক বয়ানের বাছাইকৃত ব্যবহার এবং নীতি-নির্ধারণী ক্ষমতার পুনর্বণ্টনের প্রচেষ্টাকে অবৈধ প্রমাণের চেষ্টার মাধ্যমে ঘটে থাকে। এছাড়া, এই প্রতিরোধ প্রচেষ্টা কারিগরি বা বিশেষজ্ঞ-ভিত্তিক কর্তৃত্বকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করারও চেষ্টা করবে; তারা এই মডেলটিকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভিজাততন্ত্র (elitism), সাধারণ মানুষের সাথে বিচ্ছিন্নতা কিংবা অত্যধিক প্রাতিষ্ঠানিক যৌক্তিকীকরণের (rationalization) দায়ে অভিযুক্ত করবে। ব্যবস্থাটি কারিগরি দক্ষতা ও গণতন্ত্রকে পরস্পরবিরোধী শক্তি হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করবে; অথচ বাস্তবে, কারিগরি দিকটিকে বাদ দেওয়ার ফলে মূলত তারাই লাভবান হয়, যারা আইন প্রণয়ন ও রাজনৈতিক দরকষাকষির অস্পষ্ট বা ধূসর ক্ষেত্রগুলোতে সবচেয়ে ভালো কাজ করতে পারে।

পরিবর্তনের প্রথম ধাপটি হলো আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা—অর্থাৎ প্রস্তাবের উৎস, সংশ্লিষ্ট স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়, প্রত্যাশিত প্রভাব এবং এর অগ্রগতিতে প্রভাব বিস্তারকারী পক্ষগুলোকে সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে দৃশ্যমান ও বোধগম্য করে তোলা। জনগণ যখন বুঝতে পারে কীভাবে নিয়মকানুন তৈরি হয় এবং কারা এর মাধ্যমে লাভবান হয়, তখন আরও গভীর সংস্কারের জন্য একটি জনভিত্তি তৈরি হয়। এরপর, নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় কারিগরি ও অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থার ক্রমিক অন্তর্ভুক্তিকে উৎসাহিত করতে হবে। স্বাধীন উপদেষ্টা পরিষদ, বাধ্যতামূলক জনমত গ্রহণ, উন্মুক্ত কারিগরি শুনানি, সামাজিক প্রতিনিধিত্বসহ বিষয়ভিত্তিক কমিটি এবং নাগরিক পরামর্শের প্ল্যাটফর্ম—এসবই ক্রমপুঞ্জীভূত পদক্ষেপ হিসেবে কাজ করে, যা প্রথাগত কাঠামোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের একচেটিয়া ক্ষমতাকে খর্ব করতে শুরু করে। প্রতিটি নতুন ব্যবস্থাকেই প্রমাণ করতে হবে যে, সমষ্টিগত স্বার্থের জন্য কারিগরি দক্ষতা ও জনঅংশগ্রহণ একত্রে

কাজ করতে পারে। জনগণের চাপকে পদ্ধতিগত সংস্কার, স্থায়ী কারিগরি সংস্থার শক্তিশালীকরণ এবং স্বার্থের সংঘাত (conflicts of interest) বিষয়ক তদারকি বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকর রূপ দিতে হবে। আমাদের এমন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যেখানে বিধিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ চুক্তির ওপর কম নির্ভরশীল হবে এবং জনসমক্ষে প্রকাশ্য, স্বচ্ছ ও সামাজিকভাবে যাচাইযোগ্য মানদণ্ড দ্বারা অধিকতর পরিচালিত হবে।

কোনো সমাজই পূর্ণ গণতান্ত্রিক বৈধতা ধরে রাখতে পারে না যখন সমষ্টিগত জীবন পরিচালনাকারী নিয়মকানুন তৈরির ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু ক্ষমতার কেন্দ্রে কুক্ষিগত থাকে। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো বিশেষজ্ঞ-জ্ঞান বা বিশেষায়িত দক্ষতাকে (specialization) বাধ্যতামূলক বা দমনমূলক 'টেকনোক্রেসি' বা প্রযুক্তি-শাসনে পরিণত হতে না দেওয়া। বিশেষজ্ঞ গণতন্ত্রকে প্রতিস্থাপন করেন না, বরং তাকে শক্তিশালী করেন। বর্তমান ব্যবস্থার প্রতিরোধ কাটিয়ে উঠতে এবং বৈধতা বজায় রাখতে হলে মতামত ও তথ্যের পূর্ণ স্বচ্ছতা, ব্যবহৃত প্রমাণের উন্মুক্ত প্রকাশ, সীমিত কার্যকাল বা ম্যান্ডেট এবং ক্রমাগত সামাজিক পর্যালোচনার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এমন একটি আইন যা জ্ঞান থেকে উদ্‌ভূত হলেও সমষ্টিগত জীবনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত; এমন একটি নীতি যা জোটের শক্তির ফসল না হয়ে সামাজিক ন্যায়বিচারের একটি যৌক্তিক হাতিয়ার হয়ে ওঠে। যখন কারিগরি বা বিশেষজ্ঞ-জ্ঞান ক্ষমতার সেবার পরিবর্তে জনগণের সেবায় নিয়োজিত হয়, তখন আইন তার সর্বোচ্চ ভূমিকাটি ফিরে পায়: স্থিতিশীলতা, সমতা ও ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা বিধানের মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক সহাবস্থানকে সুশৃঙ্খল করা। তথ্য-প্রমাণ ও বিশেষায়িত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা নিয়মকানুন অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পূর্বাভাসযোগ্য হয় এবং সমসাময়িক বিশ্বের জটিলতার সাথে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এটি প্রাতিষ্ঠানিক আস্থাকে সুদৃঢ় করে, আইনগত অসংগতি হ্রাস করে এবং সংকট ও কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারি ব্যবস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পরিশেষে, প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চাপ না থাকায় নীতি-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীস্বার্থের প্রভাব কমে আসে। জটিল সমাজব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন সমানভাবে উন্নত ও পরিশীলিত নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো। ভবিষ্যতে শাসনব্যবস্থা মূলত যৌথ নিয়মকানুন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক বৈধতা এবং বিশেষজ্ঞ-জ্ঞানের যথাযথ সমন্বয় সাধনের সক্ষমতার ওপরই অধিকতর নির্ভরশীল হয়ে উঠবে।

১৮. সরকারের নতুন কাঠামো

অতীতের বাস্তবতার ভিত্তিতে তৈরি কাঠামো ব্যবহার করে একটি সরকার কীভাবে একবিংশ শতাব্দীর সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করতে পারে? সমসাময়িক জটিলতা এবং ধীরগতিসম্পন্ন, খণ্ডিত ও অত্যধিক আমলাতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিক মডেলের মধ্যে এক ধরনের দ্বন্দ্ব রয়েছে। প্রযুক্তিগত রূপান্তর, বৈশ্বিক সংকট এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক চাহিদার এই বিশ্বে, জনক্ষমতা পরিচালনার পদ্ধতিকেও একই গতিতে বিবর্তিত হতে হবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকারগুলোকে স্বাস্থ্য, অবকাঠামো, শিক্ষা, পরিবেশ, ডিজিটাল নিরাপত্তা এবং নগর চলাচলের মতো ক্ষেত্রে একই সাথে নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। অথচ, প্রশাসনিক কাঠামো এখনও উল্লম্ব (vertical) এবং খণ্ডিত (compartmentalized) পদ্ধতিতে কাজ করে, যেখানে বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। বর্তমান মডেলে সরকারি নীতি বাস্তবায়নে বিলম্ব, সম্পদের অপচয়, সেবার নিম্নমান এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক জরুরি পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতা পরিলক্ষিত হয়।

মূল সমস্যাটি হলো জনপ্রশাসনের কাঠামোগত অনমনীয়তা। এর বৈশিষ্ট্য হলো অত্যধিক পদানুক্রমিক ও খণ্ডিত ব্যবস্থা এবং ধীরগতি—যার মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং কৌশলগত ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের অভাব। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো, সামাজিক সহায়তা, নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা—এসব খাত বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে, অথচ এদের সমস্যাগুলো প্রকৃতিগতভাবেই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এর ফলে সমস্যা মোকাবিলায় পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে ধীরগতি দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত এর প্রভাব পড়ে সরকার ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে ক্রমবর্ধমান দূরত্বের অনুভূতির ওপর।

জটিল সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে প্রথাগত কাঠামো সেগুলোকে দীর্ঘায়িত করে। এর মাশুল দিতে হয় সেই জনগোষ্ঠীকে, যারা মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য রাষ্ট্রের তৎপরতার ওপর নির্ভরশীল: যেমন—চিকিৎসা সেবার অপেক্ষায় থাকা পরিবার, মৌলিক অবকাঠামোর অপেক্ষায় থাকা জনগোষ্ঠী, আইনি বা প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক এবং খণ্ডিত সরকারি সেবার শিকার সাধারণ নাগরিক। আমলাতন্ত্র যখন নিজেই নিজের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন সমাজের বাস্তব জীবনপ্রবাহ গৌণ হয়ে পড়ে।

এই মডেল বজায় রেখে যারা লাভবান হয়, তারা হলো প্রশাসনিক অভিজাত শ্রেণি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার কাঠামো; যারা প্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতা, নিয়ন্ত্রণ কৌশল হিসেবে ধীরগতি এবং নির্দিষ্ট কিছু কেন্দ্রে তথ্য কুক্ষিগত রাখার সুবিধা ভোগ করে। প্রাতিষ্ঠানিক অনমনীয়তা এমন সব রাজনৈতিক গোষ্ঠীরও অনুকূলে কাজ করে, যারা সরকারি ব্যবস্থাকে প্রভাব বিস্তার, দরকষাকষি এবং জোট ধরে রাখার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

আমাদের এমন একটি পদ্ধতির প্রয়োজন যা নমনীয়, সমন্বিত এবং তথ্য-ভিত্তিক প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রস্তাবনায় পারস্পরিক সংযুক্ত কার্যকরী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরকারকে পুনর্গঠন করার কথা বলা হয়েছে, যেখানে কঠোর উল্লম্ব কাঠামোর পরিবর্তে একটি পদ্ধতিগত ও অভিযোজনক্ষম (adaptive) কাঠামো প্রবর্তন করা হবে। বিচ্ছিন্ন সব বিভাগের পরিবর্তে, জনপ্রশাসন একটি জীবন্ত ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করতে শুরু করে—যা তথ্য আদান-প্রদান, সম্ভাব্য ঝুঁকি আগে থেকেই আঁচ করা এবং সমষ্টিগত চাহিদার প্রতি আরও সুনির্দিষ্টভাবে সাড়া দিতে সক্ষম। এই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হতে হবে। প্রথম ধাপে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য-ভিত্তিক 'আন্তঃবিভাগীয় ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র' (cross-functional management centers) গড়ে তোলা; এগুলো প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য নিরাপত্তা, নগর উন্নয়ন, উৎপাদনশীল উদ্ভাবন এবং বৈষম্য হ্রাসের মতো বাস্তব সমস্যাগুলোকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হবে। এই কেন্দ্রগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করে এবং তাদের কারিগরি স্বায়ত্তশাসন ও সমন্বিত লক্ষ্য অর্জনের সুযোগ করে দেয়। দ্বিতীয় ধাপটি হলো একটি সমন্বিত ডিজিটাল শাসন-কাঠামো (digital governance infrastructure) গড়ে তোলা, যা বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান ও সামঞ্জস্য বিধান (interoperability), সামাজিক সূচকগুলোর রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ, সরকারি সম্পদের ব্যবহার ট্র্যাক করা এবং স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ের মধ্যে কার্যগত সমন্বয় নিশ্চিত করবে। এই মডেলে প্রযুক্তি রাজনীতিকে প্রতিস্থাপন করে না, বরং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা কমায় এবং ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি আগে থেকে অনুধাবন বা প্রস্তুতির সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। তৃতীয় ধাপটি হলো কার্যগত বিকেন্দ্রীকরণ, যা এই প্রস্তাবনাকে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সম্পদ পুনর্বণ্টনমূলক মডেলের (redistributive model) সাথে সংযুক্ত করে। স্থানীয় ব্যবস্থাপনা ইউনিটগুলোকে নীতিমালার দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা উচিত; তবে এই কার্যক্রম সর্বদা সরকারি কর্মদক্ষতার পরিমাপক

(performance metrics), স্বাধীন নিরীক্ষা এবং সম্প্রদায়ের সামাজিক তদারকির সাথে যুক্ত থাকতে হবে।

এটা স্পষ্ট যে প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী অভিজাত গোষ্ঠী এই রূপান্তরকে তীব্রভাবে প্রতিহত করবে। কঠোর কাঠামো ও খণ্ডিত কর্মপদ্ধতিতে অভ্যস্ত খাতগুলো এবং তথ্যের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখা গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে এই বাধা আসবে। প্রথাগত আমলাতন্ত্র কেবল অভ্যাসের বশেই নয়, বরং প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ থেকেও এই পরিবর্তনের বিরোধিতা করে; কারণ কাজের বিভাজন, প্রক্রিয়ার ধীরগতি এবং অভ্যন্তরীণ কার্যপ্রক্রিয়ার অস্বচ্ছতা তাদের প্রভাব বজায় রাখার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। প্রশাসনিক ব্যবস্থা এমন সব কারিগরি জটিলতার ক্ষেত্র তৈরি করে যা জনঅংশগ্রহণ ও কার্যকর তদারকি—উভয়কেই দূরে সরিয়ে রাখে। এই অভিজাত শ্রেণির প্রতিরোধ নানাভাবে প্রকাশ পায়—যেমন প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি, অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতা, অনমনীয় পদমর্যাদাক্রম আঁকড়ে থাকা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিশৃঙ্খলার কথিত ঝুঁকি নিয়ে নানা বয়ান তৈরি করা। যেসব সংস্কার সমন্বয়, স্বচ্ছতা ও বিকেন্দ্রীকরণ বাড়ায়, সেগুলোকে অনেক সময় জনসেবার স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরা হয়; অথচ বাস্তবে এর মূল উদ্দেশ্য হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের এমন সব অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রকে রক্ষা করা যা সহজে নিরীক্ষা করা যায় না।

এই রূপান্তরের প্রথম ধাপ হলো প্রশাসনিক কার্যপ্রবাহ, প্রতিটি সংস্থার কর্মপরিধি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্রবিন্দুগুলো চিহ্নিত ও স্বচ্ছ করে তোলা। যখন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এবং খোদ সরকারি কর্মকর্তারাও বুঝতে পারেন কোথায় কাজের জট, কাজের পুনরাবৃত্তি বা তথ্যের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, তখনই পরিবর্তনের একটি ভিত্তি তৈরি হয়। এরপর আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রগতিশীল সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে। এর উদাহরণ হতে পারে—প্রক্রিয়াগুলোর ডিজিটালাইজেশন, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ (interoperability), অপ্রয়োজনীয় বা দ্বৈত কর্মপরিধি পর্যালোচনা, তথ্যের সক্রিয় স্বচ্ছতা এবং সেবার বিকেন্দ্রীকরণ। এগুলো এমন প্রাথমিক পদক্ষেপ যা কোনো আকস্মিক বিশৃঙ্খলা ছাড়াই কাজের খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন প্রকৃতি কমিয়ে আনে। প্রতিটি অগ্রগতির মাধ্যমেই দক্ষতা, দ্রুত সাড়া প্রদানের ক্ষমতা এবং নাগরিকদের জন্য সেবার সহজলভ্যতার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সুফল দৃশ্যমান হতে হবে।

জনগণ ও প্রশাসনের পক্ষ থেকে আসা চাপকে অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার নতুন মডেলে রূপান্তর করতে হবে; যেখানে থাকবে সরকারি কার্যক্রমের ধারাবাহিক মূল্যায়ন, তদারকি পর্ষদ, নাগরিকদের দ্বারা নিরীক্ষা এবং সরকারের কৌশলগত ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে আরও নিবিড় সমন্বয়। মূল কৌশলটি হলো—জনপ্রশাসনকে কাঠামোগতভাবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার মানসিকতা থেকে সরিয়ে এনে সমষ্টিগত সমস্যাগুলোর কার্যকর সমাধানের দিকে অধিক মনোযোগী করে তোলা।

কোনো সামাজিক রূপান্তরের কর্মসূচিই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না যদি প্রশাসনিক কাঠামোটি এমনভাবে সাজানো থাকে যা ধীরগতি, বিচ্ছিন্নতা এবং তথ্যের কেন্দ্রীভূত অবস্থাকেই জিইয়ে রাখে। ক্ষমতার প্রকৃত পুনর্বণ্টনের জন্য রাষ্ট্রকে ভেতর থেকে সংস্কার করা একটি অপরিহার্য শর্ত। সুবিধাপ্রাপ্ত গোষ্ঠীর প্রতিরোধ কাটিয়ে ওঠার জন্য এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় আইনি সংস্কার, সরকারি কর্মীদের নিবিড় প্রশিক্ষণ এবং কেবল চাকরির স্থায়িত্বের পরিবর্তে সামাজিক দক্ষতার সাথে যুক্ত প্রণোদনা ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন। রাজনৈতিক প্রভাব বা দখলের হাত থেকে এই সংস্কারকে রক্ষা করা এবং প্রশাসনিক নমনীয়তা যাতে খেয়ালখুশিমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় পরিণত না হয় তা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত জরুরি।

আমাদের এমন একটি সরকারের পক্ষে কথা বলতে হবে যা কেবল ঘটনার পর প্রতিক্রিয়া দেখানোর পরিবর্তে আগাম পরিস্থিতি অনুধাবন করে, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এবং সম্মিলিত বুদ্ধিমত্তার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নতুন প্রশাসনিক কাঠামো মানেই কেবল সাংগঠনিক বিন্যাসের পরিবর্তন নয়; বরং এটি রাষ্ট্রকে সামাজিক ন্যায়বিচারের এক জীবন্ত হাতিয়ারে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া—যা বাস্তব বিশ্বের জটিলতার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে এবং জনগণের প্রয়োজন দ্রুত ও বৈধভাবে মেটাতে সক্ষম। অধিকতর সমন্বিত কাঠামো অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি কমায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং সরকারি সম্পদের ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি করে। এছাড়া, প্রযুক্তি ও প্রশাসনিক বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার অধিকতর নির্ভুল পরিকল্পনা প্রণয়ন, ফলাফলের ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ এবং জনগণের কাছে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। এটি প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা সুদৃঢ় করে এবং সরকারের কেবল প্রতিক্রিয়াশীল না হয়ে বরং প্রতিরোধমূলক বা আগাম পদক্ষেপ গ্রহণের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যেসব প্রতিষ্ঠান সময়ের সাথে বিবর্তিত হয় না, সেগুলো উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়; আর যেসব প্রতিষ্ঠান

বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজেদের পুনর্গঠন করে, সেগুলো সম্মিলিত পরিবর্তনের চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়।

১৯. রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা

রাজনীতিকে কীভাবে নিত্যবিবাদের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে জনকল্যাণ সমন্বয়ের একটি প্রকৃত ব্যবস্থায় রূপান্তর করা যায়? এই মূল প্রশ্নটি কেবল কারা ক্ষমতায় থাকবে তা নিয়ে নয়, বরং কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, বাস্তবায়ন, তদারকি এবং সময়ের সাথে সাথে তা সংশোধন করা হয়—তা নিয়ে। জটিল সমাজে রাজনীতি কেবল আলোচনা বা ক্ষমতার পালাবদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; একে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের একটি সুনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি হিসেবে কাজ করতে হয়।

বর্তমানে রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনা সরকারি বাজেট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, অবকাঠামো এবং সুযোগের বণ্টনের মতো অপরিহার্য ক্ষেত্রগুলোকে সরাসরি প্রভাবিত করে। দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব তাৎক্ষণিক: একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত শহরের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে পারে, সেবার সুযোগ বাড়াতে পারে অথবা এর বিপরীতে বৈষম্য আরও গভীর করতে পারে। রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার গুণমানই রাষ্ট্রের দক্ষতা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের আস্থার বিষয়টি নির্ধারণ করে। রাজনীতি যখন সঠিকভাবে কাজ করে, তখন সমাজের অগ্রগতি হয়। আর যখন তা ব্যর্থ হয়, তখন তার মাশুল সবাইকে দিতে হয়।

বর্তমান মডেলের সমস্যা হলো স্বল্পমেয়াদী চিন্তার প্রাধান্য এবং কৌশলগত ধারাবাহিকতার অভাব। এর মূল কারণ হলো নির্বাচনী চক্র, যা এমন সব সিদ্ধান্তকে উৎসাহিত করে যার লক্ষ্য তাৎক্ষণিক প্রভাব সৃষ্টি, দ্রুত জনদৃষ্টি আকর্ষণ এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানো যায় এমন ফলাফল অর্জন। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন প্রশাসনিক ক্ষেত্রের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, যা জটিল নীতিগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন কঠিন করে তোলে। এর ফলে কাঠামোগত প্রকল্পগুলোর ধারাবাহিকতা বজায় থাকে না, কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং দক্ষতা হ্রাস পায়; ফলে এমন সব সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে যার জন্য স্বভাবতই মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজন।

তখন রাজনীতি সংকট প্রতিরোধের পরিবর্তে কেবল সংকটের প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করে। এর মূল্য দিতে হয় সমগ্র সমাজকে: ত্রুটিপূর্ণ স্বাস্থ্যব্যবস্থার মধ্যে বসবাসকারী পরিবার, ব্যাহত শিক্ষা সংস্কারের শিকার শিক্ষার্থী, অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক নীতির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক এবং সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে অসমাপ্ত বা পরিত্যক্ত উন্নয়নকাজের সম্মুখীন শহরবাসী—সবাইকেই এই পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। এই যন্ত্রণার মূলে রয়েছে বারবার নতুন করে শুরু করার স্থায়ী অনুভূতি, সমষ্টিগত হতাশা এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থার সংকট। যেসব প্রকল্পের মাধ্যমে এক দশকের মধ্যে বাস্তবতার পরিবর্তন ঘটার কথা, সেগুলো প্রায়শই একটিমাত্র মেয়াদও টিকে থাকতে পারে না।

এই মডেল থেকে যারা লাভবান হয় তারা হলো দলীয় অভিজাত শ্রেণি এবং এমন সব রাজনৈতিক গোষ্ঠী, যারা স্বল্পমেয়াদী চিন্তাধারা, বিদ্যমান নীতিগুলোর প্রতীকী পুনঃউদ্বোধন এবং রাষ্ট্রকে নির্বাচনী মঞ্চ হিসেবে ব্যবহারের কৌশল থেকে সুবিধা পায়। এই প্রেক্ষাপটে, ধারাবাহিকতার অভাব কোনো প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়, বরং তা ক্ষমতার একটি কৌশলে পরিণত হয়।

তাই এমন একটি কার্যকর পদ্ধতির প্রয়োজন যা নির্বাচনী চক্রজনিত বিঘ্ন থেকে সুরক্ষিত থাকবে। রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে তিনটি সমন্বিত স্তরে বিন্যস্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে: দশ-বছরের কৌশলগত পরিকল্পনা, ত্রৈমাসিক লক্ষ্যের মাধ্যমে প্রশাসনিক বাস্তবায়ন এবং স্বচ্ছ সূচকের ভিত্তিতে জনগণের দ্বারা স্থায়ী মূল্যায়ন। প্রথম স্তরটি হলো ১০-বছরের কৌশলগত পরিকল্পনা। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আবাসন, পরিবহন ব্যবস্থা, খাদ্য নিরাপত্তা, উৎপাদনশীল উদ্ভাবন এবং টেকসই উন্নয়নের মতো সরকারি প্রতিটি খাতের জন্য দশ-বছর মেয়াদী পরিমাপযোগ্য ও কাঠামোগত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। এই লক্ষ্যগুলোকে একটি 'কৌশলগত ধারাবাহিকতা আইন'-এর মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করতে হবে, যাতে এগুলোর খেয়ালখুশিমতো বা স্বেচ্ছাচারী পরিবর্তন প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বেআইনি গণ্য হয়। প্রতিটি নির্বাচনের সময় আগের সব কর্মসূচি বা এজেন্ডা পুরোপুরি বদলে ফেলার অভ্যাসে অভ্যস্ত রাজনৈতিক অভিজাতদের বাধা অতিক্রম করার জন্য এটি অপরিহার্য।

দ্বিতীয় স্তরটি হলো বাধ্যতামূলক ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক লক্ষ্যের মাধ্যমে প্রশাসনিক বাস্তবায়ন। কার্যত, প্রতিটি দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যকে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা এবং ত্রৈমাসিক কর্মপরিকল্পনার ধাপে (অপারেশনাল মাইলস্টোন) ভাগ করতে হবে এবং এর সাথে বাজেট, সময়সূচি ও কারিগরি ব্যবস্থাপকদের সমন্বয় ঘটাতে হবে। এর ফলে কৌশলগত

ভিশন বা লক্ষ্য বাস্তব ও পরিমাপযোগ্য কার্যক্রমে রূপান্তরিত হয়। তৃতীয় স্তরটি হলো জনগণের দ্বারা স্থায়ী মূল্যায়ন ব্যবস্থা, যেখানে সমস্ত সূচক সর্বজনীন ডিজিটাল ড্যাশবোর্ডে উন্মুক্ত রাখতে হবে। এর মাধ্যমে জনগণ রিয়েল-টাইমে বা তাৎক্ষণিকভাবে অগ্রগতি, বিলম্ব, ব্যয়, সামাজিক প্রভাব এবং লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে পারবে। এখানে স্বচ্ছতা হলো বৈধতা অর্জনের এবং দলীয় স্বার্থের কবলে পড়া থেকে সুরক্ষার একটি কৌশল। এছাড়া, বিশেষজ্ঞ, সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, নিরীক্ষা সংস্থা এবং সামাজিক পর্যবেক্ষণকারী সংগঠনের সমন্বয়ে স্বাধীন কারিগরি পর্যবেক্ষণ পরিষদ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই পরিষদগুলোর কাজ হবে ফলাফল মূল্যায়ন করা, জনসমক্ষে প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং কোনো প্রত্যক্ষ দলীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রয়োজনীয় সংশোধনী বা পরিবর্তনের সুপারিশ করা।

এমন কিছু গোষ্ঠী রয়েছে যারা সরকারের বয়ান বা আখ্যান (narrative) নতুন করে সাজাতে, জোটের অবস্থান পরিবর্তন করতে এবং প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক চক্রে অভ্যন্তরীণ প্রভাব পুনর্বণ্টনের জন্য রাজনৈতিক অস্থিরতার ওপর নির্ভর করে; স্বাভাবিকভাবেই তারা এর তীব্র বিরোধিতা করবে। ক্ষমতার পালাবদলকে এখানে নবায়নের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হিসেবে নয়, বরং পূর্ববর্তী কর্মসূচি বাতিল, বাজেটের অগ্রাধিকার পুনর্নির্ধারণ এবং রাজনৈতিক আনুগত্যের নতুন বলয় তৈরির সুযোগ হিসেবে দেখা হয়। কর্মসূচির ধারাবাহিকতা বজায় না রাখাটা তখন ক্ষমতার একটি হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায়। কৌশলগত ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে রাষ্ট্রকে নির্বাচনী স্বার্থে ব্যবহারের সুযোগ কমে যায়; তাই যেসব দলের বা গোষ্ঠীর শক্তি নির্ভর করে স্থায়ী ভাঙন বা পরিবর্তনের ওপর, তারা এর প্রবল বিরোধিতা করবে। তারা স্থিতিশীল ব্যবস্থাপনা মডেলকে শাসনক্ষমতা পরিচালনা, রাজনৈতিক নমনীয়তা বা নিজস্ব কর্মসূচি নির্ধারণের স্বাধীনতার জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরবে। আইন প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি, বয়ান বা আখ্যান নিয়ে বিতর্ক এবং তাৎক্ষণিক সুবিধামতো অগ্রাধিকার পরিবর্তনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই বিরোধিতা প্রকাশ পাবে।

প্রথমত, রাষ্ট্রের কৌশলগত পরিকল্পনাকে তাৎক্ষণিক নির্বাচনী চক্রের প্রভাব থেকে ধাপে ধাপে আলাদা করতে হবে। এর অর্থ হলো এমন সব বাধ্যতামূলক বহু-বার্ষিক পরিকল্পনা, দীর্ঘমেয়াদী জন-লক্ষ্য এবং স্বচ্ছ সূচক তৈরি করা, যা সরকার পরিবর্তনের পরেও কার্যকর থাকবে। যখন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ধারাবাহিক লক্ষ্যের পথে চলে, তখন স্বল্পমেয়াদী আখ্যান-ভিত্তিক বিতর্কে তাদের বিভ্রান্ত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এরপর

প্রয়োজন স্থায়ী ও দক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জোরদার করা। স্বাধীন কৌশলগত পরিষদ, আন্তঃসরকারি কমিশন, লক্ষ্যমাত্রা তদারককারী সংস্থা এবং জন-পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফর্ম গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনিক অস্থিরতা কমানো সম্ভব। প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে এটি প্রমাণ করতে হবে যে, ব্যবস্থাপনার স্থিতিশীলতা গণতন্ত্রকে খর্ব করে না, বরং রাষ্ট্রকে সুবিধাবাদী ব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা করে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগুলোকে সুরক্ষা দেয়। সামাজিক চাপকে এমন আইনি কাঠামোর রূপ দিতে হবে যা কাঠামোগত নীতিগুলোর ন্যূনতম ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলোর খেয়ালখুশিমতো বাতিল বা পরিবর্তন নিষিদ্ধ করবে এবং পর্যায়ক্রমিক জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখবে। মূল কৌশলটি হলো এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাতে গণতান্ত্রিক ক্ষমতার পালাবদল যৌক্তিক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং একইসঙ্গে তা সমষ্টিগত পরিকল্পনার মূল কাঠামোকে ধ্বংস না করে।

নির্বাচনী চক্র এবং প্রভাব বিস্তারের অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রকে যখন বারবার নতুন করে সাজানো হয়, তখন কোনো সমাজই তার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে কেবল 'নতুন করে শুরু করার' ক্ষেত্র হিসেবে না দেখে, বরং জনকল্যাণের লক্ষ্যে কৌশলগত ধারাবাহিকতা বজায় রাখার হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। প্রস্তাবিত কাঠামোটিকে আইনি সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে—যার মধ্যে থাকবে ধারাবাহিকতা রক্ষার নীতিগত কাঠামো, সরকার পরিবর্তনের সময় বাধ্যতামূলক হস্তান্তর প্রক্রিয়া এবং স্বাধীন সরকারি নিরীক্ষা ব্যবস্থা। এই উদ্যোগ গণতান্ত্রিক ক্ষমতার পালাবদলকে বাধাগ্রস্ত করে না, বরং নেতৃত্বের পরিবর্তন যাতে সমষ্টিগত পরিকল্পনাকে ধ্বংস করতে না পারে, তা নিশ্চিত করে।

ঠিক এখানেই রাজনৈতিক আশার বাস্তব রূপটি ফুটে ওঠে: এমন একটি সরকার যা তাৎক্ষণিক বা অপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর না করে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি, কার্যকর বাস্তবায়ন এবং ক্রমাগত সংশোধনের প্রক্রিয়ায় কাজ করে। প্রকৃত সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সময়, ধারাবাহিকতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গীকার। এটি ছাড়া পরিবর্তনের প্রতিটি প্রতিশ্রুতিই নির্বাচনী সময়সূচির কাছে জিম্মি হয়ে পড়ে। বিভিন্ন জন-সূচকের (public indicators) সাথে যুক্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের ফলে বিভিন্ন প্রশাসনের কাজের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, হঠকারী বা অপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রবণতা কমে এবং প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা জোরদার হয়। 'রিয়েল-টাইম' বা তাৎক্ষণিক

স্বচ্ছতার ফলে জনগণ বাজেট বাস্তবায়ন, সময়সীমা রক্ষা এবং বিভিন্ন নীতির সামাজিক প্রভাব পর্যবেক্ষণ করতে পারে; অন্যদিকে, নিয়মিত কারিগরি মূল্যায়নের মাধ্যমে সম্পদের অপচয় রোধ করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুণমান উন্নত করা সম্ভব হয়। এভাবেই রাজনৈতিক কার্যক্রম কেবল বাগাড়ম্বরের ওপর নির্ভর না করে বরং সুনির্দিষ্ট ফলাফলের ভিত্তিতে মূল্যায়িত হতে শুরু করে। সমাজের ভবিষ্যৎ কেবল প্রতিশ্রুতির ওপর নয়, বরং সদিচ্ছাকে একটি দক্ষ, ধারাবাহিক ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনায় রূপান্তর করার সক্ষমতার ওপরই অধিকতর নির্ভর করবে।

২০. উৎপাদনের দৃশ্যমানতা

একটি সমাজ কীভাবে সম্পদের ন্যায্য বণ্টন নিশ্চিত করবে যদি তারা সুনির্দিষ্টভাবে না জানে যে কী উৎপাদিত হচ্ছে, কাদের জন্য উৎপাদিত হচ্ছে এবং সেই উৎপাদিত পণ্য শেষ পর্যন্ত কোথায় যাচ্ছে? যেকোনো অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় উৎপাদনের হিসাব বা নথিপত্র রাখার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ সমষ্টিগত সম্পদের ব্যবস্থাপনা মূলত নির্ভরযোগ্য তথ্যের ওপরই নির্ভর করে। হিসাব না রেখে উৎপাদন করা মানে হলো অন্ধকারে থেকে ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা। সঠিক নথিপত্র বা হিসাব রাখা উৎপাদন ব্যবস্থাকে পরিকল্পনা, স্বচ্ছতা এবং প্রকৃত বণ্টন সক্ষমতার স্তরে উন্নীত করে।

বর্তমানে কৃষি, শিল্প, জ্বালানি এবং লজিস্টিকস বা পণ্য পরিবহন ও সরবরাহ সংক্রান্ত উৎপাদনের তথ্যের একটি বড় অংশ বিভিন্ন কোম্পানি, সরকার, বেসরকারি খাত এবং বিচ্ছিন্ন স্থানীয় কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বা খণ্ডিত অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে পণ্য, কাঁচামাল এবং উদ্বৃত্তের প্রকৃত প্রবাহ বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে, যা সরবরাহ, মূল্য নির্ধারণ এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। তথ্যের এই অস্পষ্টতা বা দৃশ্যমানতার অভাব সরাসরি দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে; হিসাব সংরক্ষণের ব্যর্থতা খাদ্য অপচয়, সরবরাহ শৃঙ্খলে বিশৃঙ্খলা, কৃত্রিম সংকট এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সম্পদের অসম বণ্টনের মতো সমস্যা সৃষ্টি করে।

বর্তমান মডেলের মূল সমস্যাটি নিহিত রয়েছে উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্যের অস্পষ্টতা ও খণ্ডিত অবস্থার মধ্যে। এর কারণ হলো বিভিন্ন খাত, অঞ্চল এবং লজিস্টিকস

শৃঙ্খলের মধ্যে সমন্বিত পর্যবেক্ষণ ও তথ্য-মানকীকরণ (data standardization) ব্যবস্থার অভাব। কৃষি, শিল্প, পরিবহন, সংরক্ষণ, বণ্টন এবং বাণিজ্য—এসব খাত বিচ্ছিন্ন ডেটাবেস, অসামঞ্জস্যপূর্ণ পদ্ধতি এবং ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার স্বচ্ছতা নিয়ে কাজ করে। এর ফলে চাহিদা পূর্বাভাস দেওয়া, প্রতিবন্ধকতা (bottlenecks) শনাক্ত করা এবং উদ্‌বৃত্ত চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ে; যার ফলে অর্থনৈতিক অদক্ষতা ও ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং সরবরাহ সংকটের সময় দ্রুত সাড়া দেওয়ার সক্ষমতা কমে যায়।

যখন উৎপাদন ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে দৃশ্যমান থাকে না, তখন পুরো বণ্টন কাঠামো তার দক্ষতা হারায়। এর মাশুল দিতে হয় সমাজকে—বিশেষ করে সবচেয়ে অরক্ষিত জনগোষ্ঠীকে—যারা মুদ্রাস্ফীতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ঘাটতি, সরবরাহ শৃঙ্খলের ব্যাঘাত এবং আকস্মিক মূল্য ওঠানামার কারণে সবার আগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই ভোগান্তির মধ্যে রয়েছে খাদ্যের বর্ধিত মূল্য, ওষুধের সংকট, কৌশলগত উপকরণের সরবরাহ স্থবিরতা এবং জলবায়ু, স্বাস্থ্য বা লজিস্টিকস সংক্রান্ত জরুরি পরিস্থিতির মুখে অসহায়ত্ব। এই অস্পষ্ট মডেল থেকে যারা লাভবান হয় তারা হলো অর্থনৈতিক মধ্যস্বত্বভোগী, লজিস্টিকস খাতের প্রভাবশালী গোষ্ঠী এবং এমন সব খাত যারা তথ্যের অসমতা বা অসামঞ্জস্য থেকে সুবিধা পায়। যখন কেবল গুটিকয়েক পক্ষ উৎপাদনের প্রকৃত প্রবাহ ও মজুদের (ইনভেন্টরি) অবস্থা জানতে পারে, তখন ফটকাবাজি (speculation), কৃত্রিমভাবে সরবরাহ আটকে রাখা এবং দাম কারসাজির সুযোগ তৈরি হয়। তথ্যের এই অস্পষ্টতা অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করার একটি পরোক্ষ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

এর সমাধান হলো একটি 'জাতীয় ও আন্তঃ-কমিউনিটি ডিজিটাল উৎপাদন নিবন্ধন ব্যবস্থা' গড়ে তোলা, যা বিভিন্ন খাত, অঞ্চল এবং লজিস্টিকস শৃঙ্খলের মধ্যে সমন্বিত থাকবে। খামার, শিল্পকারখানা, বিতরণ কেন্দ্র, সমবায় এবং কমিউনিটি হাবের মতো প্রতিটি উৎপাদনকারী ইউনিট একটি নিরীক্ষাযোগ্য (auditable) পাবলিক প্ল্যাটফর্মে রিয়েল-টাইমে তাদের উৎপাদনের পরিমাণ, মজুত বা স্টকের অবস্থা, গন্তব্য, চাহিদার পূর্বাভাস এবং অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার (idle capacity) তথ্য নথিভুক্ত করবে। প্রথম ধাপে রয়েছে উৎপাদন সংক্রান্ত নিবন্ধনের প্রোটোকল বা নিয়মাবলিকে প্রমিত করা এবং খাত ও অঞ্চলভেদে অভিন্ন শ্রেণিবিভাগ তৈরি করা। দ্বিতীয় ধাপটি হলো প্রযুক্তিগত সমন্বয় সাধন: এর আওতায় থাকবে লজিস্টিকস সেন্সর, স্বয়ংক্রিয় প্রতিবেদন

ব্যবস্থা, ইনভেন্টরি বা মজুত ট্র্যাকিং ব্যবস্থা এবং উৎপাদক, পরিবহনকারী ও বিতরণ কেন্দ্রগুলোর মধ্যে আন্তঃকার্যক্ষম (interoperable) প্ল্যাটফর্মের সংযোগ। তৃতীয় ধাপে এই ব্যবস্থাকে পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত রাজনৈতিক ও কর ব্যবস্থাপনা কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করা হবে। এর ফলে সরকারি কর্তৃপক্ষ, কমিউনিটি কাউন্সিল এবং পুনর্বণ্টন ব্যবস্থাপকরা অঞ্চলভেদে উৎপাদন, উদ্বৃত্ত ও ঘাটতির চিত্র রিয়েল-টাইমে দেখতে পাবেন; যা সম্পদের দ্রুত পুনর্বণ্টন, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিবহন এবং প্রতিবন্ধকতা বা বাধাগুলো (bottlenecks) আগাম সংশোধনের সুযোগ করে দেবে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী অভিজাত গোষ্ঠী এই মডেলের তীব্র বিরোধিতা করবে। যারা পণ্যের মজুদ সংক্রান্ত তথ্যের অস্পষ্টতা, কৌশলগতভাবে পণ্য আটকে রাখা এবং কৃত্রিম ঘাটতিকে পুঁজি করে ফায়দা লোটে—এমন সব গোষ্ঠী থেকেই এই বিরোধিতা আসবে। বড় লজিস্টিকস প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক মধ্যস্বত্বভোগী এবং পণ্য পরিবহনের সাথে যুক্ত আর্থিক খাতগুলো পূর্ণ স্বচ্ছতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে; তারা বাণিজ্যিক গোপনীয়তা, পরিচালন ব্যয় বা প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা হারানোর মতো অজুহাত দাঁড় করাবে। তথ্যের এই অস্পষ্টতা কেবল কোনো কারিগরি সমস্যা নয়, বরং এটি কৃত্রিম মূল্য নির্ধারণ, মুনাফা কুক্ষিগত করা এবং সরবরাহ ব্যবস্থাকে নিজেদের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করার একটি সুপরিকল্পিত কৌশল। উৎপাদন প্রক্রিয়ার জটিলতা এবং তথ্যের খণ্ড-বিখণ্ড অবস্থার মধ্য দিয়েও এই প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। দীর্ঘ সরবরাহ শৃঙ্খল, একাধিক মধ্যস্বত্বভোগী এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন ব্যবস্থা এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যেখানে স্বচ্ছতা বা নিরীক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে; ফলে সমাজ বুঝতে পারে না কোথায় পর্যাপ্ত উৎপাদন হচ্ছে, কোথায় প্রকৃত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং কোথায় কৃত্রিম ঘাটতি তৈরি বা অর্থনৈতিকভাবে তার অপব্যবহার করা হচ্ছে। সুতরাং, তথ্যের এই অস্পষ্টতা অর্থনৈতিক ক্ষমতার একটি হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটি ছোট কিন্তু সুদৃঢ় এবং ক্রমপুঞ্জিত কারিগরি পদক্ষেপের মাধ্যমে এগিয়ে নিতে হবে। প্রথমত, কৌশলগত খাতগুলোতে উৎপাদন, মজুদ, বিতরণ এবং ভোগের ওপর নজর রাখার জন্য সর্বজনীন ও আন্তঃকার্যক্ষম (interoperable) ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। যখন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এবং সরকারি সংস্থাগুলো খাদ্য, জ্বালানি, ওষুধ, শিল্প-কাঁচামাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রকৃত প্রবাহ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবে, তখন ফটকাবাজারি বা কারসাজির সুযোগ নাটকীয়ভাবে কমে যাবে।

এরপর, উৎপাদক, পরিবেশক, লজিস্টিকস কেন্দ্র এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর মধ্যে পর্যায়ক্রমিক সমন্বয় সাধন করতে হবে। সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, বাধ্যতামূলক পর্যায়ক্রমিক প্রতিবেদন, পণ্যের ব্যাচ বা উৎস শনাক্তকরণ (traceability), পারস্পরিক নিরীক্ষা এবং মানসম্মত তথ্য আদান-প্রদান—এসব প্রাথমিক পদক্ষেপ উৎপাদন ব্যবস্থায় আকস্মিক কোনো বিঘ্ন না ঘটিয়েই স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে। জনমত ও কারিগরি চাপকে স্থায়ী আইনি কাঠামো, সরকারি তদারকি ব্যবস্থা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে গঠিত অর্থনৈতিক তদারকি পর্ষদে রূপান্তর করতে হবে। মূল কৌশলটি হলো উৎপাদন ও ঘাটতি সংক্রান্ত তথ্য যাতে কেবল গুটিকয়েক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে কুক্ষিগত না থাকে, তা নিশ্চিত করা। যখন তথ্যের স্বচ্ছতা একটি সর্বজনীন অবকাঠামোয় পরিণত হয়, তখন পণ্যের ঘাটতি নিয়ে কারসাজি বা ফটকাবাজারি করার সক্ষমতা কাঠামোগতভাবেই হ্রাস পায়।

ঘাটতি যখন মুনাফা ও ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ারে পরিণত হয়, তখন কোনো অর্থনীতিই তার বৈধতা ধরে রাখতে পারে না। সম্পদের সুষম বণ্টন, মূল্য স্থিতিশীলতা এবং সমষ্টিগত সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ করে তোলা অপরিহার্য। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সর্বজনীন স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সংবেদনশীল ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে; অর্থাৎ সমষ্টিগত স্বার্থ ক্ষুণ্ন না করেই বৈধ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। স্বাধীন নিরীক্ষা ব্যবস্থা, অসঙ্গতি শনাক্তকরণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার এবং কম তথ্য প্রদান বা ইচ্ছাকৃত কারসাজির বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বিধান—এসবই অত্যন্ত জরুরি। এর লক্ষ্য কেবল অর্থনৈতিক দক্ষতা অর্জন নয়, বরং সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে বৈষম্য প্রতিরোধ করা। ঘাটতি যখন সামাজিক সংকটে রূপ নেয়, তখন তার মোকাবিলা করার পরিবর্তে—এই ব্যবস্থাটি সম্ভাব্য বিঘ্ন বা সংকট আগে থেকেই আঁচ করার এবং জনগণের দুর্ভোগ শুরুর আগেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ করে দেয়।

উৎপাদন যখন দৃশ্যমান হয়ে ওঠে, তখন সম্পদ পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি কেবল একটি বিমূর্ত প্রতিশ্রুতিতে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তা সমষ্টিগত জীবন সুরক্ষার একটি বাস্তব ও কার্যকর ব্যবস্থায় পরিণত হয়। সমন্বিত ও হালনাগাদ তথ্যের সহায়তায় উদ্‌বৃত্ত সম্পদের দ্রুত পুনর্বণ্টন, অপচয় হ্রাস, ঘাটতির পূর্বাভাস গ্রহণ এবং অধিকতর নিখুঁতভাবে বিনিয়োগের পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে। তথ্যের স্বচ্ছতা

সামাজিক নিয়ন্ত্রণকে জোরদার করে এবং অর্থনৈতিক পক্ষগুলোর মধ্যে তথ্যের অসামঞ্জস্য কমিয়ে আনে, যার ফলে সরবরাহ ও দামের ক্ষেত্রে কৃত্রিম কারসাজি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। উৎপাদন তখন কেবল একটি অর্থনৈতিক ফলাফল হিসেবেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা সম্প্রদায়ের একটি কৌশলগত সম্পদে পরিণত হয়। উৎপাদনের হিসাব রাখা মানেই হলো নিজের যত্ন নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমাজের সক্ষমতারই হিসাব রাখা। উৎপাদিত বিষয়গুলো যখন পুরোপুরি দৃশ্যমান হয়, তখন ভবিষ্যৎ আর তাৎক্ষণিক ও অপরিকল্পিত সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে না; বরং তা জ্ঞান, পূর্বাভাসযোগ্যতা এবং সমষ্টিগত দায়িত্ববোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠতে শুরু করে।

চতুর্থ পর্ব — উৎপাদন, শ্রম ও সম্পদ

২১. টেকসই ও সহজলভ্য (বা মুক্ত) যন্ত্রপাতি

একটি সমাজ কীভাবে তার নাগরিকদের কাছ থেকে শ্রম, স্বনির্ভরতা ও উৎপাদনশীলতা আশা করতে পারে, যদি তাদের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত উপায় বা উপকরণ থেকেই বঞ্চিত রাখা হয়? এই বিষয়টি সামাজিক জীবনের এক বাস্তব ভিত্তিকে স্পর্শ করে: আর তা হলো শ্রমের উপকরণের প্রাপ্যতা। কৃষি থেকে শুরু করে নির্মাণকাজ, কারুশিল্প থেকে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন—মানুষের যাবতীয় উৎপাদন প্রক্রিয়াই যন্ত্রপাতির ওপর নির্ভরশীল। যখন এই যন্ত্রপাতিগুলো দুষ্প্রাপ্য, ভঙ্গুর, আর্থিকভাবে নাগালের বাইরে বা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তখন সামগ্রিক উৎপাদন-ক্ষমতা কৃত্রিমভাবে সীমিত হয়ে পড়ে।

বর্তমান মডেলের সমস্যাটি নিহিত রয়েছে 'পরিকল্পিত ভঙ্গুরতা' (planned fragility) এবং উপকরণের সীমিত প্রাপ্যতার মধ্যকার সংযোগে। এর মূল কারণ হলো এমন সব উৎপাদন ব্যবস্থা যা পণ্যের দীর্ঘস্থায়িত্বের চেয়ে দ্রুত ভোগ বা ব্যবহারের আবর্তনকে (accelerated turnover) অগ্রাধিকার দেয়; ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলো স্বল্পস্থায়ী পণ্যে পরিণত হয়। তখন পণ্য অকেজো হয়ে পড়া বা সেকেলে হয়ে যাওয়াটা কেবল কোনো প্রযুক্তিগত পরিণতি থাকে না, বরং তা একটি সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক কৌশলে পরিণত হয়। এর ফলে প্রতিনিয়ত পণ্য প্রতিস্থাপন, ক্রয় এবং ঋণের

প্রয়োজন দেখা দেয়, যা বস্তুগত বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে; কারণ কম সম্পদের অধিকারী জনগোষ্ঠী উৎপাদন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং দৈনন্দিন জীবনের স্বনির্ভরতার জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক উপকরণগুলো থেকে বঞ্চিত থাকে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সুদৃঢ় করার পরিবর্তে বর্তমান ব্যবস্থাটি পরনির্ভরতা ও অপচয়কে আরও গভীর করে তোলে। এর মাশুল গুনতে হয় অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক, ক্ষুদ্র উৎপাদক, শিক্ষার্থী, স্বল্প আয়ের পরিবার এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে—যারা কাজ, গৃহ-মেরামত, কৃষি, নির্মাণ এবং আয়-উপার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না। এর বেদনাদায়ক দিকটি হলো নিজের বসবাসের পরিবেশ তৈরি, মেরামত বা সংরক্ষণের অক্ষমতা। যখন কোনো পরিবার তাদের ঘরের ছাদ মেরামত করতে পারে না, কোনো ক্ষুদ্র কৃষক যন্ত্রপাতির অভাবে ফসল হারায়, কিংবা কোনো তরুণ কারিগরি শিক্ষার উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয়—তখনই বৈষম্য সরাসরি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। এই মডেল থেকে যারা লাভবান হয় তারা হলো সেই সব শিল্পখাত যা দ্রুত পণ্য প্রতিস্থাপন চক্র ও 'ব্যবহার-ও-ফেলে-দেওয়া' (disposable) ভোগ-ব্যবস্থার ওপর চালিত হয়, এবং সেই সব অর্থনৈতিক গোষ্ঠী যারা চাহিদার বাধ্যতামূলক নবায়নের ওপর নির্ভরশীল। পরিকল্পিত ভঙ্গুরতা মানুষের প্রয়োজনকে নিরন্তর ভোগে রূপান্তরিত করে এবং অর্থনৈতিক পরনির্ভরতাকে মূল্য আহরণের একটি স্থায়ী কৌশলে পরিণত করে।

এখানে সর্বজনীন যন্ত্রপাতির জন্য একটি সরকারি ও সমবায়ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হচ্ছে। এই যন্ত্রপাতিগুলো এমনভাবে নকশা করা হবে যাতে সেগুলোর উচ্চ স্থায়িত্ব, সহজ রক্ষণাবেক্ষণ ও মডুলারিটি (অংশবিশেষ পরিবর্তনযোগ্যতা) নিশ্চিত থাকে এবং শ্রমিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও ক্ষুদ্র উৎপাদকদের জন্য সেগুলো বিনামূল্যে বা অত্যন্ত কম মূল্যে (ভর্তুকিযুক্ত) সহজলভ্য হয়। প্রথমেই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির একটি জাতীয় তালিকা বা ক্যাটালগ তৈরি করতে হবে, যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে কৃষি, নির্মাণকাজ, গৃহ-রক্ষণাবেক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা, ইলেকট্রনিক্স মেরামত এবং সমষ্টিগত উৎপাদনের মৌলিক যন্ত্রপাতি। এই পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে উন্মুক্ত উৎপাদন মানদণ্ড অনুসরণ করা উচিত, যাতে এগুলোর যন্ত্রাংশ একে অপরের সাথে অদলবদলযোগ্য হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী কার্যকাল নিশ্চিত করা যায়। এছাড়া, বিভিন্ন এলাকা, সমবায় সমিতি, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সংগঠনের উদ্যোগে

‘কমিউনিটি টুল লেন্ডিং সেন্টার’ বা সরঞ্জাম ধার দেওয়ার কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই কেন্দ্রগুলো এক ধরনের ‘উৎপাদনমুখী গ্রন্থাগার’ হিসেবে কাজ করবে; ফলে নাগরিকদের স্থায়ীভাবে ব্যক্তিগত মালিকানায় কোনো সরঞ্জাম কেনার খরচ বহন না করেই প্রয়োজনে সেগুলো ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হবে। এতে সামাজিক ব্যয় হ্রাস পায় এবং সমষ্টিগত স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি, আঞ্চলিক উৎপাদন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত স্থানীয় ‘মডুলার’ মেরামত ও উৎপাদন কর্মশালাগুলোকে শক্তিশালী করাও অত্যন্ত জরুরি। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হলো—সরকারি কর্মশালা, কমিউনিটি ল্যাব, মানসম্মত যন্ত্রাংশ মুদ্রণ বা তৈরি, কারিগরি রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র এবং মেরামত ও সংযোজন বিষয়ক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এই প্রস্তাবে বিভিন্ন সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশের জন্য ‘ওপেন-সোর্স’ বা উন্মুক্ত নকশার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার ফলে সমবায় সমিতি ও ক্ষুদ্র স্থানীয় শিল্পসহ বিভিন্ন পর্যায়ে আঞ্চলিকভাবে এসব যন্ত্রাংশ পুনরায় উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এর ফলে কোনো সরঞ্জাম কেবল একবার ব্যবহারযোগ্য পণ্য হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি সামাজিক অবকাঠামোয় পরিণত হবে।

শিল্পখাতের যেসব অংশ 'পরিকল্পিত অকেজোকরণ' (planned obsolescence)-এর ওপর নির্ভরশীল, যেসব নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ঘন ঘন পণ্য পরিবর্তনের ওপর টিকে আছে এবং যেসব বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ভোগের অবিরাম চক্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে—তাদের কাছ থেকে বিরোধিতা আসবেই। এই প্রতিরোধ নানাভাবে প্রকাশ পাবে: নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে লবিং, পেটেন্ট ব্যবহারের ওপর বিধিনিষেধ, খুচরা যন্ত্রাংশ প্রাপ্তিতে বাধা, মেরামতের অধিকার খর্ব করা এবং উন্মুক্ত মানদণ্ড বা 'ওপেন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন'-এর বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করা। পণ্যের ভঙ্গুরতা কোনো কারিগরি ত্রুটি নয়, বরং এটি বাজারকে প্রতিনিয়ত সচল রাখার একটি সুপরিকল্পিত কৌশল। এছাড়া উদ্ভাবন ও ক্রমাগত পণ্য পরিবর্তনের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমেও এই ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই ব্যবস্থা স্থায়িত্বকে 'প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা' হিসেবে তুলে ধরে; অথচ বাস্তবে, পণ্যের দ্রুত অকেজো হয়ে পড়াটা প্রকৃত বস্তুগত অগ্রগতির চেয়ে মুনাফা অর্জনের মডেলকেই বেশি সহায়তা করে। ফলে, 'ফেলে দেওয়ার সংস্কৃতি' (throwaway culture) ভোগ অব্যাহত রাখার একটি অর্থনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়।

প্রথমত, আমাদের অবশ্যই মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং যন্ত্রাংশ, নির্দেশিকা ও কারিগরি সহায়তা পাওয়ার সর্বজনীন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। যখন সমাজের

সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ও পণ্যের কার্যকর আয়ুষ্কাল বাড়াতে সক্ষম হয়, তখন কৃত্রিমভাবে পণ্য পরিবর্তনের চক্রের ওপর নির্ভরশীলতা কমে আসে। উৎপাদন ব্যবস্থার এই যুক্তি বা ধারাকে ধীরে ধীরে পরিবর্তনের জন্য প্রগতিশীল নীতিমালার প্রয়োজন—যেমন পণ্যের ন্যূনতম স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা, যন্ত্রাংশের মানদণ্ড নির্ধারণ, কারিগরি তথ্যের উন্মুক্ততা, মডুলার বা খণ্ডাংশ-ভিত্তিক নকশাকে উৎসাহিত করা এবং পরিকল্পিত অকেজোকরণ সীমিত করা। প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট সুফল দেখাতে হবে: যেমন পারিবারিক খরচ কমানো, বর্জ্য উৎপাদন হ্রাস এবং জনগণের বস্তুগত স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি। এরপর, সমাজের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতকে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে—যার মধ্যে থাকবে মেরামতের অধিকার বিষয়ক আইন প্রণয়ন, কমিউনিটি ওয়ার্কশপের জন্য সরকারি অর্থায়ন, রক্ষণাবেক্ষণ সমবায়কে উৎসাহিত করা এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উন্মুক্ত পদ্ধতিতে উৎপাদনের জন্য প্রণোদনা প্রদান। ক্রমাগত পণ্য ফেলে দেওয়ার চেয়ে স্থায়িত্ব বজায় রাখা যে সমাজের জন্য অর্থনৈতিকভাবে অধিক লাভজনক, সেই অবস্থানটি আমাদের জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে।

দীর্ঘস্থায়ী যন্ত্রপাতি প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় কমায়, পরিবারের নিয়মিত খরচ হ্রাস করে এবং স্থানীয় উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ায়। বিনামূল্যে বা যৌথ ব্যবহারের সুযোগ অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণকে শক্তিশালী করে। মডুলার বা খণ্ডাংশ-ভিত্তিক মেরামতের মডেল বিশেষায়িত কাজ, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং পারস্পরিক সংযুক্ত ও স্বনির্ভর সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্ভাবন ছড়িয়ে দেওয়ার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে। যখন যন্ত্রপাতি কেবল বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর সুবিধা বা বিলাসিতা না হয়ে সমষ্টিগত অধিকারে পরিণত হয়, তখন কাজ আর নির্ভরশীলতার বিষয় থাকে না, বরং তা সৃজনশীল শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কোনো সমাজই বস্তুগত ন্যায়বিচার বজায় রাখতে পারে না যদি তার উৎপাদন ব্যবস্থা পুরোপুরি ব্যবহারযোগ্য পণ্যকে অকালে ধ্বংস করার ওপর নির্ভরশীল হয়। দীর্ঘস্থায়ী ও সহজলভ্য যন্ত্রপাতি কেবল অর্থনৈতিক দক্ষতার প্রতীকই নয়, বরং জীবনধারণের উপকরণের ওপর মানুষের দৈনন্দিন নিয়ন্ত্রণ বা সার্বভৌমত্বেরও পরিচায়ক। একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ কেবল আয়ই পুনর্বণ্টন করে না, বরং তা কাজ করা, গড়ে তোলা, মেরামত করা এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেরাই গড়ে তোলার সক্ষমতাকেও পুনর্বণ্টন করে।

২২. পরিবহন ও পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা

প্রয়োজনীয় মানুষের কাছে সময়মতো পণ্য না পৌঁছালে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করে কী লাভ? এটিই জীবনের বস্তুগত ভিত্তির মূল কথা, কারণ সমস্ত উৎপাদনই পণ্য চলাচলের (circulation) ওপর নির্ভরশীল। খাদ্য, ওষুধ, যন্ত্রপাতি, পোশাক এবং কাঁচামাল তখনই তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে যখন সেগুলো দক্ষতার সাথে, নিরাপদে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছাতে পারে। বিতরণের ব্যবস্থা না করে কেবল উৎপাদন করা মানেই শেষ পর্যন্ত সম্পদের অপচয়। আজকের বিশ্বে পণ্য পরিবহন অর্থনীতি ও দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি। লজিস্টিকস বা পণ্য পরিবহন ও সরবরাহ ব্যবস্থার গুণমান পণ্যের দাম, প্রাপ্যতা, সংকটকালীন সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগের ওপর প্রভাব ফেলে। পরিবহন ব্যবস্থায় কোনো বিঘ্ন ঘটলে তার প্রভাব তাৎক্ষণিক হয়: খরচ বৃদ্ধি, স্থানীয় পর্যায়ে পণ্যের ঘাটতি, পচনশীল পণ্যের ক্ষতি এবং কেন্দ্রীয় ও প্রান্তিক অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য।

বর্তমান মডেলের সমস্যাটি নিহিত রয়েছে পরিবহন পথের কেন্দ্রীকরণ, কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবহন পদ্ধতির ওপর অত্যধিক নির্ভরতা এবং আঞ্চলিক সংযোগের অভাবের মধ্যে। এর মূল কারণ হলো এমন লজিস্টিকস ব্যবস্থা যা স্বল্পমেয়াদী সর্বোচ্চ মুনাফার কথা ভেবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, সুষম বণ্টন বা সরবরাহের সামাজিক নিরাপত্তার কথা ভেবে নয়। ব্যবস্থাটি স্থিতিস্থাপকতা, বিস্তৃত নেটওয়ার্ক বা আঞ্চলিক ধারাবাহিকতাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে বরং অধিক লাভজনক পথ, বড় শহর এবং উচ্চ অর্থনৈতিক ঘনত্বের অঞ্চলগুলোতে পণ্য প্রবাহকে কেন্দ্রীভূত করে। এর ফলে নির্দিষ্ট কিছু পরিবহন রুটে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়, কম লাভজনক এলাকাগুলো উপেক্ষিত থাকে এবং কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা বা 'বটলনেক' (bottleneck) বৃদ্ধি পায়। এর চূড়ান্ত ফলাফল হলো এমন সব অঞ্চলের সৃষ্টি যেখানে পণ্যের উদ্‌বৃত্ত থাকে এবং অন্য অঞ্চলে স্থায়ী ঘাটতি দেখা দেয়—অথচ সবার জন্য প্রয়োজনীয় মোট উৎপাদন পর্যাপ্ত থাকে।

বর্তমান ব্যবস্থাটি সামাজিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে নয়, বরং অর্থনৈতিক সুবিধার ভিত্তিতে পণ্য বণ্টন করে। এর মাশুল দিতে হয় প্রত্যন্ত জনপদ, গ্রামীণ অঞ্চল, শহরের প্রান্তিক এলাকা এবং সেইসব জনগোষ্ঠীকে যারা খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি, শিক্ষা-সামগ্রী ও উৎপাদনের উপকরণের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল। এমন পরিস্থিতি তৈরি

হয় যখন এক উৎপাদন কেন্দ্রে খাদ্য থাকে অথচ অন্য জায়গায় মানুষ ক্ষুধার্ত থাকে; কিংবা ওষুধ মজুদ থাকা সত্ত্বেও পরিবহন পথের সমস্যার কারণে হাসপাতালে চিকিৎসায় বিলম্ব ঘটে। লজিস্টিকস বা পরিবহন ব্যবস্থার এই বৈষম্য প্রাচুর্যকে স্থানীয় পর্যায়ের ঘাটতিতে পরিণত করে। এই মডেল থেকে যারা লাভবান হয় তারা হলো বড় ও কেন্দ্রীভূত লজিস্টিকস কোম্পানি, কৌশলগত রুটের নিয়ন্ত্রণকারী মধ্যস্বত্বভোগী এবং সেইসব অর্থনৈতিক গোষ্ঠী যারা পরিবহন ও বণ্টনের কেন্দ্রীকরণের ফলে সুবিধা পায়। মুষ্টিমেয় কিছু পক্ষের হাতে অবকাঠামোর কেন্দ্রীকরণ বাজারের ওপর আধিপত্য বিস্তার, দাম নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অনুযায়ী অগ্রাধিকার নির্ধারণের সুযোগ করে দেয়। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের জন্য একটি সমন্বিত লজিস্টিকস নেটওয়ার্ক তৈরির সুপারিশ করা হয়েছে, যা আঞ্চলিক বিতরণ কেন্দ্র দ্বারা সংগঠিত হবে এবং সড়ক, রেল, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জলপথ এবং স্থানীয় স্বল্প-দূরত্বের ব্যবস্থার মতো একাধিক মাধ্যমের দ্বারা আন্তঃসংযুক্ত থাকবে। এর বাস্তবায়ন সুস্পষ্ট কয়েকটি ধাপে হওয়া উচিত। প্রথম পর্যায় হলো উৎপাদন ও চাহিদার প্রবাহের একটি জাতীয় এবং আন্তঃ-সম্প্রদায়িক মানচিত্র তৈরি করা, যেখানে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ডিজিটাল ব্যবস্থার সাথে ভোগ, ঋতুগত প্রভাব এবং আঞ্চলিক ঝুঁকির পূর্বাভাসকে একীভূত করা হবে। প্রতিটি উৎপাদন অঞ্চলে আঞ্চলিক গুদাম ও পুনঃবিতরণ কেন্দ্র থাকা উচিত, যা যাতায়াতের সময় কমাতে এবং বিঘ্নের ঝুঁকি কমাতে কৌশলগতভাবে সঠিক স্থানে অবস্থিত হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ হলো পরিবহণ মাধ্যমের বৈচিত্র্যকরণ। একটিমাত্র ব্যবস্থার উপর, বিশেষ করে সড়ক পরিবহনের উপর, অতিরিক্ত নির্ভরতা এই কাঠামোকে জ্বালানি সংকট, অবরোধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অবকাঠামোগত বিপর্যয়ের মতো পরিস্থিতিতে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। এই নেটওয়ার্কে মহাসড়ক, রেলপথ, জলপথ এবং স্থানীয় স্বল্প-দূরত্বের বিতরণ ব্যবস্থার সমন্বয় থাকা উচিত এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের জন্য করিডোরগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। সুতরাং, আমাদের অবশ্যই একটি রিয়েল-টাইম ডিজিটাল পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে, যেখানে মজুত পণ্যের হিসাব রাখা, চাহিদার পূর্বাভাস, গতিশীল রুট অপ্টিমাইজেশন এবং খাদ্য, ঔষধ ও হাসপাতালের সরঞ্জামের মতো গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীর জন্য স্বয়ংক্রিয় অগ্রাধিকার নির্ধারণের ব্যবস্থা থাকবে। অর্থনৈতিক দক্ষতার পাশাপাশি, রুট ব্যবস্থাপনায় অবশ্যই বণ্টনগত মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এর অর্থ হলো, কম লাভজনক, প্রত্যন্ত বা স্বল্প জনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোকে সরবরাহ থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। একটি নিরবচ্ছিন্ন ন্যূনতম সরবরাহের প্রাতিষ্ঠানিক নিশ্চয়তা থাকতে হবে, যা পুনর্বণ্টনমূলক

ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থায়ন করা হবে এবং যা শুধুমাত্র বাজারের ওঠানামা থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

বৃহৎ লজিস্টিকস বা পণ্য পরিবহন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, মধ্যস্থতাকারী এবং আঞ্চলিক রুটে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারকারী গোষ্ঠীগুলো পণ্যের প্রবাহ বিকেন্দ্রীকরণ ও স্বচ্ছতা আনার প্রচেষ্টার তীব্র বিরোধিতা করবে। তারা নিয়ন্ত্রক সংস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি, একচেটিয়া চুক্তির সুরক্ষা, অবকাঠামো উন্মুক্তকরণে বাধা প্রদান এবং অধিকতর বিকেন্দ্রীভূত মডেলগুলো পরিচালনগতভাবে অবাস্তব—এমন যুক্তি প্রচারের মাধ্যমে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে। বিশেষ করে যখন নতুন কাঠামোটি ফটকা কারবারের (speculation) সুযোগ সীমিত করে, সময়সীমা ও খরচের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ কমায়, অথবা কঠোর বাণিজ্যিক মুনাফার যুক্তিতে ঐতিহাসিকভাবে অবহেলিত কম লাভজনক এলাকাগুলোতে সেবা প্রদানে বাধ্য করে—তখনই এই প্রতিরোধ আরও জোরালো হবে। রুট ও বিতরণ কেন্দ্রগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ কোনো লজিস্টিক দক্ষতার পরিচায়ক নয়, বরং এটি অর্থনৈতিক ক্ষমতার কৌশলগত কেন্দ্রীভবন। যারা পরিবহনের রুট, সময় এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে, তারাই পণ্যের চূড়ান্ত মূল্য, আঞ্চলিক প্রাপ্যতা এবং সরবরাহের স্থিতিশীলতাকেও প্রভাবিত করে। রুটগুলো নিজেদের দখলে রাখা, অধিক লাভজনক বাজারগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং প্রান্তিক অঞ্চলগুলোকে ভৌগোলিকভাবে সেবার আওতার বাইরে রাখা—এসবই বস্তুগত বৈষম্য তৈরির পরোক্ষ কৌশলে পরিণত হয়।

প্রথমেই আমাদের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য—বিশেষ করে খাদ্য, ওষুধ, জ্বালানি, উৎপাদনের কাঁচামাল এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর—প্রধান প্রবাহগুলোর মানচিত্র তৈরি ও তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে হবে। যখন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এবং সরকারি সংস্থাগুলো সরবরাহের বাধা (bottlenecks), রুটের কেন্দ্রীভবন এবং পদ্ধতিগতভাবে সেবা-বঞ্চিত এলাকাগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবে, তখন গভীরতর সংস্কারের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ভিত্তি তৈরি হবে। এরপর, লজিস্টিকস অবকাঠামোর পর্যায়ক্রমিক বিকেন্দ্রীকরণকে উৎসাহিত করতে হবে; এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে আঞ্চলিক বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন, সমবায়ভিত্তিক রুট পরিচালনায় প্রণোদনা, সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং ভৌগোলিক কভারেজ বা সেবার আওতাভুক্তির লক্ষ্যমাত্রা সম্বলিত সরকারি চুক্তি। এর ফলে আকস্মিক কোনো বিশৃঙ্খলা ছাড়াই আঞ্চলিক একচেটিয়া আধিপত্য হ্রাস পাবে। প্রতিটি নতুন কাঠামোকে অবশ্যই খরচ কমানো,

সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি এবং সংকটের মুখে অধিকতর সহনশীলতা বা স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শনের সক্ষমতা প্রমাণ করতে হবে। জনচাপকে এমন সব নিয়ন্ত্রক কাঠামোতে রূপান্তর করতে হবে যা লজিস্টিকস খাতের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে, কম লাভজনক অঞ্চলে ন্যূনতম সেবা প্রদান বাধ্যতামূলক করবে, একচেটিয়া ব্যবসায়িক কার্যকলাপের ওপর তদারকি করবে এবং সরকারি বা সমবায়ভিত্তিক পরিচালকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। মূল কৌশলটি হলো পণ্যের পরিবহন ব্যবস্থাকে কেবল তাৎক্ষণিক মুনাফার ওপর নির্ভরশীল থাকার প্রবণতা থেকে বের করে আনা।

কোনো সমাজই বণ্টনমূলক ন্যায়বিচার বজায় রাখতে পারে না যখন পণ্যের প্রাপ্যতা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন রুটের নিয়ন্ত্রণ এবং জনসংখ্যার নির্দিষ্ট অংশের ভৌগোলিক বঞ্চনার ওপর নির্ভর করে। ন্যায়সঙ্গতভাবে পণ্য পরিবহন করা সামাজিক সংহতি বা ঐক্যের একটি অপরিহার্য শর্ত। এখানেই উৎপাদন কেবল তার উৎপত্তিস্থলে সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। প্রকৃত উন্নয়ন কেবল সম্পদ উৎপাদনের মধ্যেই নিহিত নয়, বরং সেই সম্পদ প্রতিটি সম্প্রদায়, প্রতিটি পরিবার এবং যাদের প্রয়োজন তাদের সবার কাছে পৌঁছানো নিশ্চিত করার মধ্যেই নিহিত। উৎপাদন ও পরিবহনের মধ্যে সমন্বয় অপচয় কমায়, লজিস্টিকস সংক্রান্ত ক্ষতি হ্রাস করে এবং ভোক্তা পর্যায়ে পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখে। এর ফলে, আগে প্রান্তিক অবস্থায় থাকা জনগোষ্ঠীগুলো একটি সুশৃঙ্খল ও নির্ভরযোগ্য সরবরাহ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়, যা আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করে। একই সাথে, পরিবহন পদ্ধতির বৈচিত্র্য জলবায়ু সংকট, সড়ক যোগাযোগে বিঘ্ন কিংবা অর্থনৈতিক অভিঘাতের মুখে টিকে থাকার সক্ষমতা বা সহনশীলতা বৃদ্ধি করে। পরিবহন তখন কেবল একটি আনুষঙ্গিক সেবা হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে বস্তুগত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এক কৌশলগত অবকাঠামোয় পরিণত হয়।

২৩. পুনর্জন্মগত নিষ্কাশন এবং কৌশলগত সম্পদ

যে সম্পদগুলো সম্ভব করে তার উৎসকে ধ্বংস না করে কিভাবে আমরা জীবনের বস্তুগত ভিত্তিকে টিকিয়ে রাখতে পারি? উদ্ভিদ এবং খনিজ নিষ্কাশনের বিষয়টি একটি নিষ্পত্তিমূলক অবস্থান দখল করে, কারণ এটি উত্পাদনশীল চাহিদা এবং গ্রহের ভবিষ্যতের ক্ষমতা সংরক্ষণের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কাজ করে। প্রতিটি সমাজ কাঠ, তন্তু,

ধাতু, শিলা, জল এবং কৌশলগত খনিজগুলির উপর নির্ভর করে। যাইহোক, এই সম্পদগুলি যেভাবে আহরণ করা হয় তা নির্ধারণ করে যে উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী হবে নাকি স্ব-ধ্বংসাত্মক হবে।

বর্তমান মডেলের সমস্যাটি এর রৈখিক নিষ্কাশনমূলক যুক্তিতে রয়েছে। কারণটি স্বল্পতম সময়ে সম্পদের সর্বাধিক নিষ্কাশনের দিকে ভিত্তিক সিস্টেমগুলির মধ্যে থাকে, কোনটি বা কম পরিবেশগত পুনঃসংযোজন, দুর্বল বিতরণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রায় কোনও আন্তঃপ্রজন্মগত জবাবদিহিতা নেই। মাটি, বন, জল এবং খনিজ মজুদ অবিলম্বে বরাদ্দের জন্য উপলব্ধ মূল্যের অসীম মজুদ হিসাবে বিবেচিত হয়। আমরা যা দেখি তা হল মাটি, বন, জলের উত্স এবং খনিজ মজুদের প্রগতিশীল অবক্ষয়, যা বিশ্বব্যাপী কৌশলগত সম্পদ নিয়ন্ত্রণকারী কয়েকটি এজেন্টের হাতে ভবিষ্যতের অভাব, পরিবেশগত ভঙ্গুরতা এবং অর্থনৈতিক ঘনত্বের দিকে পরিচালিত করে।

পুনরায় পূরণ না করে নিষ্কাশনের অর্থ বর্তমানের ভবিষ্যতকে গ্রাস করা। যারা এই মূল্য পরিশোধ করে তারা হল স্থানীয় সম্প্রদায়, গ্রামীণ জনগণ, পেরিফেরাল অঞ্চল, এবং প্রজন্ম এখনও জন্মগ্রহণ করেনি। এর পরিণতি হল মাটির উর্বরতা হারানো, জল দূষণ, জীববৈচিত্র্য হ্রাস, জলবায়ুর ঝুঁকি বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সরাসরি নির্ভরশীল অঞ্চলগুলির অর্থনৈতিক দুর্বলতা। যখন পুনঃপূরণ ছাড়া বন অপসারণ করা হয়, বৃষ্টিপাত হ্রাস পায়। পানির উৎস ক্ষয় হলে জনগোষ্ঠী অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরিকল্পনা ছাড়াই যখন খনিজ মজুদ শেষ হয়ে যায়, তখন স্থানীয় অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। এই মডেল থেকে যারা লাভবান হয় তারা হল বৃহৎ উত্তোলনকারী এজেন্ট, অর্থনৈতিক গোষ্ঠী যারা ছাড়কে কেন্দ্রীভূত করে, কাঁচামালে নিবিড় শিল্প চেইন এবং আর্থিক অভিজাতরা যারা প্রাকৃতিক সম্পদকে দ্রুত পুঁজি সঞ্চয়ে রূপান্তরিত করে। উৎপন্ন সম্পদ উৎপত্তি অঞ্চলে থাকে না, আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈষম্য প্রসারিত হয়।

একটি পুনর্জন্মমূলক এবং হিসাবযুক্ত নিষ্কাশন মডেল সমর্থন করা হয়, যেখানে সমস্ত উদ্ভিদ বা খনিজ নিষ্কাশন একটি প্রতিস্থাপন পরিকল্পনা, আঞ্চলিক পুনরুদ্ধার এবং স্থায়ী পাবলিক ট্র্যাকিং দ্বারা অনুষঙ্গী করা আবশ্যক। প্রথম ধাপে পরিবেশগত পুনর্জন্মের প্রকৃত ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে বার্ষিক নিষ্কাশন কোটা তৈরি করা হয়, যা স্বাধীন প্রযুক্তিগত গবেষণা, জলবায়ু পর্যবেক্ষণ এবং বায়োমের ক্রমাগত মূল্যায়ন দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। নিষ্কাশন বাজারের চাহিদা দ্বারা চালিত হওয়া বন্ধ করে এবং অঞ্চলের

পরিবেশগত সীমা মেনে চলতে শুরু করে। তারপর, আমাদের অবশ্যই কৌশলগত সম্পদের একটি জাতীয় ডিজিটাল রেজিস্ট্রি বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রতিটি নিষ্কাশন ইউনিটকে অবশ্যই রিয়েল টাইমে নিষ্কাশিত আয়তন, প্রভাবিত এলাকা, সম্পদের গন্তব্য, উৎপন্ন বর্জ্য এবং পুনরুদ্ধারের সময়সূচী রেকর্ড করতে হবে। এর পরে, আমাদের বাধ্যতামূলক পরিবেশগত পুনরুদ্ধার তহবিল তৈরি করতে হবে, যা সরাসরি নিষ্কাশন কার্যকলাপ দ্বারা অর্থায়ন করা হয়। শোষণ দ্বারা উত্পন্ন মূল্যের অংশ অবশ্যই পরিবেশ পুনরুদ্ধার, জল ধারণ, মাটি পুনর্জন্ম এবং সম্প্রদায় পুনর্বাসনের আকারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অঞ্চলে ফিরে আসবে। গাছপালার ক্ষেত্রে, স্থানীয় পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য, জেনেটিক বৈচিত্র্য এবং পরিবেশগত কার্যাবলীকে সম্মান করে প্রজাতি এবং বায়োম দ্বারা প্রযুক্তিগত পুনর্বনায়নের মাধ্যমে পুনরুদ্ধার ঘটতে হবে। খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রে, ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ, জল সুরক্ষা, ভূতাত্ত্বিক স্থিতিশীলতা এবং শিল্প বর্জ্যের সর্বাধিক পুনর্ব্যবহার সহ এলাকার ব্যাপক পুনর্বাসন প্রয়োজন।

বৃহৎ আহরণকারী প্রতিষ্ঠান, বিশেষ সুবিধাভোগী গোষ্ঠী এবং নিবিড় সম্পদ-শোষণের ওপর নির্ভরশীল শিল্প-কাঠামোসমূহ—পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা, পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং সম্পদ পুনরুদ্ধারের বাধ্যবাধকতার বিরোধিতা করবে; বিশেষ করে যখন এসব পদক্ষেপ তাদের স্বল্পমেয়াদী মুনাফা কমিয়ে দেয়। এই বিরোধিতা বিভিন্ন রূপে দেখা দিতে পারে: যেমন—নিয়ন্ত্রণমূলক নীতিমালার ক্ষেত্রে লবিং বা তদবির, বাছাইকৃত আইনি লড়াই, লাইসেন্স প্রদানকারী সংস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি এবং জনপরিসরে এমন বয়ান বা ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া যে, পরিবেশগত বিধিনিষেধ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বকে অসম্ভব করে তোলে। ব্যক্তিগত বা করপোরেট স্বার্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রণকারী ব্যবস্থাকে করায়ত্ত করা (regulatory capture) এই রূপান্তরের অন্যতম প্রধান ঝুঁকি, যা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন চরম স্বচ্ছতা। এই বিরোধিতা কেবল মূল নিয়মনীতির বিরুদ্ধেই নয়, বরং কার্যকর তদারকি ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও পরিচালিত হবে। ব্যবস্থাটি এমনভাবে কাজ করবে যাতে ধীরে ধীরে নমনীয়তা, শিথিল ব্যাখ্যা এবং জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা বা 'ধূসর এলাকা' তৈরি করা যায়; যার ফলে আইনি নিয়মকানুন মেনে চলার ভান করে সর্বোচ্চ মাত্রায় সম্পদ আহরণের সুযোগ বজায় রাখা সম্ভব হয়।

এই পরিবর্তনের সূচনা হতে হবে কঠোর ও কারিগরিভাবে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে—যেখানে সম্পদ আহরণের সীমা নির্ধারণ, ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পুনরুদ্ধার

বাধ্যতামূলক করা, ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ এবং পরিবেশগত ও সামাজিক ক্ষতির জন্য আর্থিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার বিধান থাকবে। যখন নিয়মকানুনগুলো অস্পষ্ট বা সাধারণ প্রকৃতির না হয়ে সুনির্দিষ্ট পরিমাপক বা মানদণ্ডভিত্তিক হয়, তখন বিধিমালা ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এরপর আমাদের এমন সব ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যা ব্যক্তিগত স্বার্থের নিয়ন্ত্রণকে দুর্বল করে দেয়; যেমন—স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার তত্ত্বাবধানে স্বাধীন ও স্থায়ী পরিবেশগত নিরীক্ষা, ডেটা প্রযুক্তির মাধ্যমে এলাকাভিত্তিক পর্যবেক্ষণ, আহরণ সংক্রান্ত তথ্যের প্রকাশ এবং ক্ষতির অনুপাতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। নিয়ম না মানলে লাইসেন্স স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থগিত করার বিষয়টি একটি বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ হিসেবে কার্যকর হতে হবে, যা কোনোভাবেই রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক অস্থিরতার দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

জনগণের চাপকে কার্যকর পদক্ষেপে রূপান্তর করতে হবে—যেমন জন-পর্যবেক্ষণ পরিষদ গঠন, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং প্রকৃত প্রভাবের ভিত্তিতে বিশেষ সুবিধা বা লাইসেন্সগুলোর পর্যায়ক্রমিক পর্যালোচনা করা। এর লক্ষ্য হলো কৌশলগত সম্পদ ব্যবস্থাপনাকে কেবল তাৎক্ষণিক মুনাফার মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হতে না দেওয়া। সম্পদের ব্যবহার বন্ধ করা এর লক্ষ্য নয়, বরং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার শর্তসাপেক্ষে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য। কৌশলগত সম্পদ কেবল বর্তমানের নয়, বরং তা আমাদের সম্মিলিত ভবিষ্যতের অংশ। দায়িত্বশীলভাবে সম্পদ আহরণের অর্থ হলো এটি স্বীকার করা যে, প্রকৃত সম্পদ কেবল আহরণ করা বস্তুর মধ্যেই নিহিত নয়, বরং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য যা সংরক্ষিত থাকে, তার মধ্যেও নিহিত।

২৪. খাদ্য শিল্প এবং এর সামাজিক ভূমিকা

কীভাবে এটা সম্ভব যে বিশ্বজুড়ে অভূতপূর্ব মাত্রায় খাদ্য উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার? এই প্রশ্নটি জীবনের বস্তুগত ভিত্তির অন্যতম বড় একটি বৈপরীত্যকে তুলে ধরে: উৎপাদনের প্রাচুর্য মানেই যে সবার জন্য ন্যায্য পুষ্টি নিশ্চিত হওয়া—বিষয়টি এমন নয়। একটি সমাজের খাদ্যের জোগান কেবল উৎপাদনের ওপর নির্ভর করে না; বরং খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বিতরণ এবং

একটি সমষ্টিগত অধিকার হিসেবে খাদ্যের প্রকৃত প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার ওপরও তা নির্ভর করে।

বর্তমান বিশ্বে, প্রাথমিক উৎপাদন এবং চূড়ান্ত ভোগের মধ্যবর্তী একটি কৌশলগত অবস্থানে রয়েছে খাদ্য শিল্প। এটি শস্য, মাংস, শাকসবজি, দুধ এবং অন্যান্য কাঁচামালকে সহজলভ্য, দীর্ঘস্থায়ী এবং ব্যাপকভাবে বিতরণযোগ্য পণ্যে রূপান্তর করে। দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব অপরিসীম: স্কুলের খাবার থেকে শহরের সরবরাহ ব্যবস্থা, হাসপাতালের খাবার থেকে গৃহস্থালির ভোগ—সবক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, এই শিল্পের গুণমান সরাসরি জনস্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার ব্যয়, অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতাকে প্রভাবিত করে।

বর্তমান মডেলটির মূল সমস্যা হলো খাদ্য উৎপাদন এবং খাদ্যের সামাজিক ভূমিকার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। এর কারণ নিহিত রয়েছে এমন সব শিল্প কাঠামোর মধ্যে, যা মুনাফা সর্বোচ্চকরণ, বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ বা কেন্দ্রীকরণ এবং উচ্চ বাণিজ্যিক আবর্তনশীলতা সম্পন্ন অতি-প্রক্রিয়াজাত (ultra-processed) পণ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতিতে চলে। জনগণের পুষ্টির চাহিদার ওপর ভিত্তি করে খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খল সাজানোর পরিবর্তে, এই ব্যবস্থাটি মুনাফা, বাজারের সুবিধা এবং পণ্য আবর্তনের গতিকে প্রাধান্য দেয়। এর ফলে আমরা দেখি ব্যাপক অপচয়, প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বৈষম্য এবং পুষ্টির পরিবর্তে ভোগের যুক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া; যার ফলে কোথাও খাদ্যের অতিরিক্ত জোগান আবার কোথাও তীব্র ঘাটতি দেখা দেয় এবং জনস্বাস্থ্যের সূচকগুলোর অবনতি ঘটে। বর্তমান মডেলে, এই শিল্প মানুষের চেয়ে বাজারকেই বেশি পুষ্ট করে। এই ব্যবস্থায় যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা হলো স্বল্প আয়ের পরিবার, বেড়ে ওঠার বয়সে থাকা শিশু, বয়স্ক মানুষ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং বড় বিতরণ কেন্দ্র থেকে দূরে অবস্থিত অঞ্চলের বাসিন্দারা। এর ফলে একদিকে যেমন ক্ষুধা ও অন্যদিকে অতিরিক্ত অপচয় দেখা দেয়; তেমনি কম পুষ্টিমানসম্পন্ন পণ্যের কারণে স্থূলতার পাশাপাশি অপুষ্টির অস্তিত্ব এবং পরিমাণগত প্রাচুর্যের সাথে গুণগত খাদ্য-দারিদ্র্যের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এই বৈষম্য কেবল অর্থনৈতিক গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তা জৈবিক রূপ নিয়ে মানুষের শরীরের অংশে পরিণত হয়। এই কাঠামো থেকে যারা লাভবান হয় তারা হলো বড় বড় খাদ্যপণ্য কোম্পানি, কেন্দ্রীভূত বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং এমন সব খাত যাদের মুনাফা নির্ভর করে কম উৎপাদন খরচ ও উচ্চ মুনাফার মার্জিনযুক্ত পণ্যের ব্যাপক

বিক্রির ওপর। অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলে খাদ্য তার মৌলিক ভূমিকা থেকে বিচ্যুত হয়ে আর্থিক লেনদেন বা পুঁজি আবর্তনের একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়। প্রথম প্রস্তাবিত দিকটি হলো অপরিহার্য প্রক্রিয়াজাতকরণ; এর আওতায় শিল্প-ক্ষমতার একটি অংশকে আইনগত ও অর্থনৈতিকভাবে উচ্চ পুষ্টিমান ও কম খরচের মৌলিক খাদ্যসামগ্রী—যেমন শস্যদানা, পুষ্টিসমৃদ্ধ (ফর্টিফাইড) আটা, সহজলভ্য প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর টিনজাত খাবার, দুধ, প্রয়োজনীয় দুগ্ধজাত পণ্য এবং শিশুদের খাবার—উৎপাদনের দিকে পরিচালিত করতে হবে। এতে শিল্পের ভূমিকা কেবল বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে খাদ্য নিরাপত্তা কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হবে। দ্বিতীয় দিকটি হলো আঞ্চলিক বিতরণযোগ্য মজুত ব্যবস্থা। প্রতিটি অঞ্চলে স্থায়ী নিয়ন্ত্রণমূলক মজুত ব্যবস্থা চালু করতে হবে, যা লজিস্টিক নেটওয়ার্ক এবং পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে বর্ণিত সমন্বিত উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকবে। এই মজুত ব্যবস্থা খাদ্য ঘাটতি, জলবায়ুজনিত পরিবর্তন, সরবরাহ সংকট এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে। তৃতীয় দিকটি হলো উদ্বৃত্ত খাদ্যের পূর্ণাঙ্গ ও বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহার। নিরাপদ উদ্বৃত্ত খাদ্য, ভোগের উপযোগী উপজাত (by-products) এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার কাছাকাছি থাকা খাদ্যসামগ্রী সরকারি ও সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে স্কুল, হাসপাতাল, গণ-রান্নাঘর (soup kitchens), আশ্রয়কেন্দ্র এবং বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতে পৌঁছে দিতে হবে। এর ফলে সম্ভাব্য অপচয়যোগ্য খাদ্যসামগ্রী বিতরণযোগ্য খাদ্যে রূপান্তরিত হবে।

এই পরিবর্তনটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন হওয়া উচিত। শুরুতে পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহের—বিশেষ করে যেসব পণ্য খাদ্য নিরাপত্তার ওপর সর্বাধিক প্রভাব ফেলে—জন্য সুস্পষ্ট কর-প্রণোদনা বা ছাড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর প্রগতিশীল নিয়ন্ত্রণমূলক ও চুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে হবে; যেমন—পরিহারযোগ্য অপচয়ের জন্য আনুপাতিক হারে জরিমানা, নিশ্চিত কেনাকাটার জন্য সরকারি চুক্তি, ভোগের উপযোগী উদ্বৃত্ত খাদ্যের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক অনুদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং স্বচ্ছ মজুত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা। প্রতিটি পদক্ষেপ অপচয়কে অর্থনৈতিকভাবে কম লাভজনক করে তুলবে এবং এর ফলে ক্ষুধা হ্রাস, উৎপাদনের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সরবরাহের অধিকতর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত হবে। জনমত ও চাপের ফলে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক স্থায়ী আইন প্রণয়ন, কৌশলগত মজুত পর্যবেক্ষণ পরিষদ গঠন এবং শিল্প, বিতরণ ব্যবস্থা ও সরকারি পুষ্টি কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হবে।

খাদ্যকে মানবিক উপযোগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন কেবল একটি বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে গণ্য করার প্রবণতা আমাদের অবশ্যই রোধ করতে হবে।

এর লক্ষ্য শিল্পখাতকে দমিয়ে রাখা নয়, বরং একে তার মৌলিক সামাজিক দায়িত্বের সাথে পুনরায় সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা—অর্থাৎ কেবল বাজারের চাহিদা মেটানো বা পণ্য আদান-প্রদান নয়, বরং মানুষের অন্নসংস্থান নিশ্চিত করা। বাধ্যতামূলক মজুত ব্যবস্থা, অপচয় রোধ এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মতো বিষয়গুলো যখন বড় শিল্পগোষ্ঠী, বিতরণকারী নেটওয়ার্ক এবং লজিস্টিকস মধ্যস্থতাকারীদের স্বল্পমেয়াদী মুনাফায় আঘাত হানে, তখন তারা এর বিরোধিতা করবে। এই বিরোধিতা আসবে নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে তদবির, মজুত নীতির ওপর চাপ সৃষ্টি, বর্জ্য অপসারণের শর্ত শিথিল করা এবং তাৎক্ষণিক মুনাফা-কেন্দ্রিক বাণিজ্যিক কার্যক্রমের পক্ষ সমর্থনের মাধ্যমে। খাদ্যের প্রাচুর্য ও ক্ষুধার সহাবস্থান কোনো উৎপাদন-অক্ষমতার কারণে নয়, বরং বিতরণ ও অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতার ফল।

এমন একটি সমাজের আকাঙ্ক্ষা করা হচ্ছে যেখানে ক্ষুধার্ত মানুষ থাকা সত্ত্বেও খাওয়ার উপযোগী কোনো খাবার ফেলে দেওয়া হবে না এবং যেখানে শিল্পখাত পুনরায় মানুষের মর্যাদার সেবায় নিয়োজিত হবে। পুষ্টির নিশ্চয়তা ছাড়া খাদ্য উৎপাদন একটি নৈতিক ব্যর্থতা; এই কাঠামোকে নতুন করে সাজানোর অর্থ হলো ব্যবস্থাকে তার মহৎ উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে আনা। পুষ্টি-কেন্দ্রিক উৎপাদন খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা কমায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখে এবং জনস্বাস্থ্যের সূচকগুলোর উন্নতি ঘটায়। আঞ্চলিক মজুত ব্যবস্থাপনা লজিস্টিকস ও জলবায়ুজনিত সংকটের ঝুঁকি কমায়, আর সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার অপচয় ও উৎপাদন কাঠামোর ওপর চাপ হ্রাস করে। খাদ্যের প্রাচুর্য যতক্ষণ না সবার পাতে পৌঁছায়, ততক্ষণ কোনো সমাজ নিজেকে উন্নত বলে দাবি করতে পারে না। যখন খাদ্যশিল্প বাজারের যুক্তির পরিবর্তে মানুষের মর্যাদার সেবায় আত্মনিয়োগ করে, তখন জীবনের বস্তুগত ভিত্তিটি অবশেষে তার সবচেয়ে অপরিহার্য কাজটি সম্পন্ন করে—আর তা হলো সমষ্টিগত ভবিষ্যতের সুরক্ষা।

২৫. প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল পোশাক

পোশাকের মতো একটি মৌলিক প্রয়োজন কীভাবে প্রকৃতির প্রতি অত্যন্ত ক্ষতিকর কর্মকাণ্ডের অন্যতম একটিতে পরিণত হলো? পোশাক কেবল সাংস্কৃতিক বা নান্দনিক প্রকাশের মাধ্যম নয়; এটি সুরক্ষা, মর্যাদা এবং কার্যকারিতারও প্রতীক। বর্তমানে পোশাক শিল্প বিশাল সব উৎপাদন প্রক্রিয়ার চালিকাশক্তি—যার মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক তন্তুর চাষ থেকে শুরু করে কৃত্রিম উপাদানের সংশ্লেষণ, রং করা, উৎপাদন এবং বিশ্বব্যাপী বিতরণ। বেঁচে থাকা, কাজ করা এবং সমাজে মিশে চলার জন্য প্রতিটি মানুষই পোশাকের ওপর নির্ভরশীল। এই শিল্প বিপুল পরিমাণ পানি, শক্তি ও কাঁচামাল ব্যবহার করে এবং সেই সাথে ক্রমবর্ধমান হারে বস্ত্র-বর্জ্য (textile waste) তৈরি করে—বিশেষ করে 'ফাস্ট ফ্যাশন' বা দ্রুত পরিবর্তনশীল ও একবার ব্যবহারযোগ্য (disposable) ভোগের মডেলে।

বর্তমান মডেলের সমস্যাটি নিহিত রয়েছে দ্রুত পণ্য পরিবর্তনের প্রবণতা এবং স্বল্প স্থায়িত্বের যুক্তির মধ্যে। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ফ্যাশন-চক্র, সহজে পচে না এমন কৃত্রিম উপাদান এবং ক্রমাগত পণ্য পরিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে ব্যাপক উৎপাদনের মাধ্যমেই এই প্রবণতা প্রকাশ পায়। যে পোশাক মানুষের সুরক্ষা, আত্মপরিচয় ও মর্যাদার প্রয়োজন মেটানোর কথা, তা আজ তাৎক্ষণিক ভোগ ও দ্রুত বর্জ্যে পরিণত হওয়ার পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। এর ফলে পুরোপুরি ব্যবহারযোগ্য পোশাকও অকালে পরিত্যক্ত হচ্ছে, প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর চাপ বাড়ছে এবং বস্ত্র-বর্জ্যের পরিমাণ জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা প্রত্যক্ষ করছি পরিবেশের অবক্ষয়, পানি দূষণ এবং সীমিত সম্পদের অত্যধিক ব্যবহার। পোশাক তখন আর কেবল প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যম থাকে না, বরং তা 'সাংস্কৃতিক অচলতা' বা পুরনো হয়ে যাওয়ার ধারণাকে উসকে দেয়। এই প্রক্রিয়ার মাশুল গুনতে হয় সেই সব জনগোষ্ঠীকে যারা উৎপাদন প্রক্রিয়াজনিত পরিবেশগত ক্ষতির শিকার—যেমন যেসব অঞ্চলে পানির অত্যধিক ব্যবহার ও রং বা কৃত্রিম মাইক্রোফাইবারের কারণে দূষণ ঘটে, কিংবা যেসব এলাকা বস্ত্র-বর্জ্যের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোর দৈনন্দিন জীবনে এর প্রভাব পড়ে সবচেয়ে বেশি; তাদের ওপর নিম্নমানের পোশাক বারবার পরিবর্তনের চাপ থাকে, ফলে একটি মৌলিক প্রয়োজন একসময় বারবার বহন করতে হওয়া অসম ব্যয়ের বোঝায় পরিণত হয়। এই মডেল থেকে যারা লাভবান হয় তারা হলো বড় বড় 'ফাস্ট-ফ্যাশন' চেইন, ব্যাপক

উৎপাদনে নিয়োজিত বস্ত্রশিল্প গোষ্ঠী এবং এমন সব খাত যাদের মুনাফা নির্ভর করে ক্রমাগত পণ্য পরিবর্তন ও কৃত্রিমভাবে নতুন ফ্যাশন বা ট্রেন্ড তৈরির ওপর। এই 'ফেলে দেওয়ার সংস্কৃতি' (throwaway culture) তখন স্থায়ী অর্থনৈতিক শোষণের একটি কৌশলে পরিণত হয়।

পুনরুৎপাদনযোগ্য তন্তু (regenerative fibers), মডুলার উৎপাদন পদ্ধতি এবং বাধ্যতামূলক পুনঃব্যবহার প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে একটি পোশাক শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে জোর দেওয়া হচ্ছে। এর প্রথম ধাপে প্রাকৃতিক ও পুনরুৎপাদনযোগ্য তন্তুকে—যেমন পুনরুৎপাদনযোগ্য তুলা, লিনেন, টেকসই পশম এবং স্থানীয় পরিবেশের সাথে মানানসই আঞ্চলিক উদ্ভিদ-তন্তুকে—অগ্রাধিকার দিতে হবে। বস্ত্র উৎপাদন প্রক্রিয়াকে স্থানীয় অঞ্চল এবং পরিবেশগত উৎপাদন ক্ষমতার সাথে পুনরায় সংযুক্ত করা প্রয়োজন। এরপর, প্রতিটি পোশাকের ক্যাটাগরি বা ধরন অনুযায়ী ন্যূনতম স্থায়িত্বের মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। প্যান্ট, জ্যাকেট, ইউনিফর্ম, শিশুদের পোশাক এবং কর্মক্ষেত্রের পোশাকের মতো অত্যাবশ্যকীয় পোশাকগুলোকে স্থায়িত্ব, সেলাইয়ের মান, মেরামতযোগ্যতা এবং ন্যূনতম আয়ুষ্কালের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক কারিগরি মানদণ্ড পূরণ করতে হবে। তৃতীয় ধাপে সমবায় সমিতি, কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে সমন্বিতভাবে পোশাক মেরামত, কাস্টমাইজেশন (গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন) এবং পুনর্ব্যবহারের কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এর ফলে পোশাক কেবল একবার ব্যবহার করে ফেলে দেওয়ার বস্তুর পরিবর্তে একটি মেরামতযোগ্য সম্পদে পরিণত হয়। তখন পোশাকগুলো আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিস্থাপিত না হয়ে দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের চক্রের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হতে থাকে। ব্যবহারের মেয়াদ শেষে পোশাক সংগ্রহের একটি ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার আওতায় পোশাক ও কাপড় ফেরত নিয়ে সেগুলোকে বাছাই, পুনর্ব্যবহার, টুকরো করা বা শিল্প-উৎপাদন প্রক্রিয়ায় পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এভাবে বস্ত্রসামগ্রী পুনরায় উৎপাদন চক্রে ফিরে আসে, যা কাঁচামাল আহরণ এবং বর্জ্যের পরিমাণ—উভয়ই হ্রাস করে।

বড় আকারের 'ফাস্ট ফ্যাশন' চেইন, বস্ত্রশিল্পের বিশাল প্রতিষ্ঠান এবং স্বল্পমূল্য ও দ্রুত পণ্য আবর্তনের (high turnover) ওপর নির্ভরশীল শিল্পখাতগুলো সাধারণত স্থায়িত্ব, পণ্যের উৎস-শনাক্তকরণ (traceability) এবং 'রিভার্স লজিস্টিকস' বা পণ্য ফেরত আনার প্রক্রিয়ার মতো বাধ্যতামূলক মানদণ্ডের বিরোধিতা করে—বিশেষ করে যখন এসব

পদক্ষেপ তাদের মুনাফার হার ও ভোগের গতি কমিয়ে দেয়। এই বিরোধিতা মূলত নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে লবিং, কঠোর সনদ বা সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি এবং এমন সব প্রচারণার মাধ্যমে প্রকাশ পায় যা স্থায়িত্ব বা টেকসই ব্যবস্থাকে অনিবার্য মূল্যবৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার সাথে যুক্ত করে। পোশাকের দ্রুত অচল বা সেকেলে হয়ে পড়ার বিষয়টি কেবল নান্দনিক ধারার পরিবর্তনের কারণেই ঘটে না; বরং এটি এমন এক পরিকল্পিত ব্যবস্থার ফল যা ক্রমাগত নতুন পোশাক কেনা, দ্রুত ফেলে দেওয়া এবং প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য তৈরির প্রবণতাকে উৎসাহিত করে। তখন কাপড়, নকশা, সেলাই এবং বিতরণ ব্যবস্থা—সবকিছুই পণ্যের দীর্ঘস্থায়িত্বের পরিবর্তে দ্রুত বিক্রয় ও আবর্তনের (turnover) লক্ষ্যকে প্রাধান্য দেয়। ফলে পোশাক আর শরীরের একটি ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ হিসেবে থাকে না, বরং তা বারবার ভোগের একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়।

এই রূপান্তর প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে হবে টেকসই উৎপাদন, পরিবেশ-পুনরুদ্ধারকারী (regenerative) উপাদান এবং পরিবেশের ওপর কম প্রভাব ফেলে এমন বস্ত্র সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে—যার জন্য থাকবে সুনির্দিষ্ট কর-প্রণোদনা। দ্বিতীয় ধাপে প্রগতিশীল নীতিমালার প্রয়োগ প্রয়োজন; যেমন—পরিহারযোগ্য বস্ত্র-বর্জ্যের ওপর কর আরোপ, পণ্য ব্যবহারের পরবর্তী পর্যায়ে উৎপাদকের দায়বদ্ধতা বিষয়ক আইন, পণ্য ফেরত আনার (রিভার্স লজিস্টিকস) বাধ্যবাধকতা, পোশাকের ন্যূনতম আয়ুষ্কাল নির্ধারণ এবং সরকারিভাবে টেকসই মানদণ্ডের সনদ প্রদান। এসব ব্যবস্থা পণ্য ফেলে দেওয়ার প্রচলিত পদ্ধতিকে অর্থনৈতিকভাবে কম লাভজনক করে তোলে এবং বর্জ্য হ্রাস, পণ্যের দীর্ঘস্থায়িত্ব বৃদ্ধি ও উৎপাদন ও সংরক্ষণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে সহায়তা করে। জনমত বা গণচাপকে সরকারি সনদ ব্যবস্থা, মেরামত ও পুনঃব্যবহারকারী সমবায়ের জন্য প্রণোদনা, স্থানীয় উৎপাদন ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণ এবং সামাজিক-পরিবেশগত মানদণ্ড পর্যবেক্ষণের মতো উদ্যোগে রূপান্তর করতে হবে। নান্দনিকতাকে যেন কোনোভাবেই বস্তুগত ধ্বংসযজ্ঞের কাছে নতিস্বীকার করতে না হয়, তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

এর লক্ষ্য পোশাকের নান্দনিক প্রকাশ বা সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করা নয়, বরং একে দ্রুত অচল হয়ে পড়ার সেই ধ্বংসাত্মক মানসিকতা থেকে মুক্ত করা। পোশাক যেন কেবল ফেলে দেওয়ার বস্তুতে পরিণত না হয়; বরং তা যেন মানুষের জীবন

এবং যে অঞ্চলে তা উৎপাদিত হয়েছে, তার একটি দায়িত্বশীল সম্প্রসারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এমন এক অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন যেখানে প্রয়োজনীয় কোনো কিছুই প্রকৃতির ক্ষতি করে না এবং যেখানে বস্তুগত মর্যাদার পাশাপাশি গ্রহের সুরক্ষাও নিশ্চিত থাকে। পণ্যের স্থায়িত্ব অতিরিক্ত সম্পদ ব্যবহার কমায়, পুনঃব্যবহার বর্জ্য কমায় এবং নবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক তন্তুর ব্যবহার দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত ক্ষতি হ্রাস করে। একই সাথে, স্থানীয় পর্যায়ে মেরামত ও পুনঃব্যবহারের কর্মশালাগুলো দক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, স্থানীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে এবং মানসম্মত পোশাকের সহজলভ্যতা বাড়ায়। যখন পোশাককে একটি চক্রাকার ও সচেতন ব্যবস্থার অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তখন সমষ্টিগত ভবিষ্যতের সাথে কোনো আপস না করেই জীবনের বস্তুগত ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হয়।

২৬. পেশার প্রকৃত গুরুত্ব

একটি সচল সমাজকে কী টিকিয়ে রাখে—নির্দিষ্ট কিছু পেশার প্রতীকী মর্যাদা, নাকি সমষ্টিগত জীবনযাত্রাকে সচল রাখা বিশেষায়িত কাজের প্রকৃত গুরুত্ব? প্রতিটি সামাজিক কাঠামোই কারিগরি জ্ঞান, সুনির্দিষ্ট দক্ষতা এবং এমন সব কাজের ওপর নির্ভরশীল যার জন্য প্রয়োজন প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ও দায়িত্ববোধ। এই গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া কেবল মর্যাদার বিষয় নয়, বরং এটি কার্যগত ন্যায়বিচার ও সভ্যতার ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রশ্ন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য, প্রকৌশল, শিক্ষা, লজিস্টিকস, উৎপাদন, প্রযুক্তি, জ্বালানি ও জন-ব্যবস্থাপনার মতো অপরিহার্য ক্ষেত্রগুলোতে বিশেষায়িত পেশাজীবীদের উপস্থিতি রয়েছে। এই পেশাজীবীরা অবকাঠামো নির্মাণ করেন, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করেন, বিভিন্ন ব্যবস্থা বা পদ্ধতি গড়ে তোলেন এবং উদ্ভাবনের প্রসার ঘটান। নির্দিষ্ট কিছু পেশার প্রতি আরোপিত মর্যাদা শিক্ষার ক্ষেত্রে পছন্দ, মেধার বণ্টন এবং এমনকি জটিল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমাজের সক্ষমতাকেও প্রভাবিত করে।

বর্তমান মডেলের সমস্যাটি নিহিত রয়েছে সামাজিক গুরুত্ব এবং বস্তুগত বা প্রতীকী স্বীকৃতির মধ্যকার অসামঞ্জস্য বা বিকৃতির মধ্যে। এর মূল কারণ হলো এমন সব সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো যা নির্দিষ্ট কিছু পেশাকে মূলত আর্থিক লাভ, বাজারের

মর্যাদা বা দৃশ্যমানতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে; অথচ সমষ্টিগত জীবনের জন্য সমানভাবে অপরিহার্য অন্যান্য কাজ কম পারিশ্রমিক পায়, লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে যায় কিংবা সামাজিকভাবে অবমূল্যায়িত হয়। আমরা এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি যেখানে অতিরিক্ত গুরুত্বপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলোতে পেশাজীবীদের ভিড় বাড়ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোতে ক্রমশ কর্মী-সংকট দেখা দিচ্ছে; ফলে সামাজিক ব্যবস্থায় কার্যগত ভারসাম্যহীনতা তৈরি হচ্ছে এবং অপরিহার্য পেশাগুলো যোগ্য কর্মীর অভাবে ভুগছে। এই মডেলে পেশার মর্যাদা সবসময় তার প্রকৃত গুরুত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। এর মাশুল পুরো সমাজকেই দিতে হয়, তবে বিশেষ করে সেই গোষ্ঠীগুলোকে যারা সরাসরি অপরিহার্য পরিষেবার ওপর নির্ভরশীল: যেমন স্বাস্থ্যসেবা কর্মীর অভাবে থাকা রোগী, দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থার শিক্ষার্থী, মৌলিক কারিগরি সহায়তা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠী এবং কাঠামোগত গুরুত্বপূর্ণ খাতে কর্মীর অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার। এর ফলে অপরিহার্য পেশাজীবীদের ওপর কাজের অতিরিক্ত চাপ, পেশাগত অসুস্থতা, মেধা পাচার (ব্রেইন ড্রেইন) এবং সরকারি ও বেসরকারি পরিষেবার মানের অবনতি ঘটে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক খাতগুলো লাভবান হয় ঠিকই, কিন্তু তারা দৃশ্যমানতা ও পুঁজিকে কেন্দ্র করে মর্যাদাকে কুক্ষিগত করে রাখে, যা প্রকৃত সমষ্টিগত প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন। বাজার ব্যবস্থা সাধারণত লাভজনক স্বল্পতা এবং আয় তৈরির সক্ষমতাকে পুরস্কৃত করে, সামাজিক অবদানকে নয়। ফলে শিক্ষক, নার্স, রক্ষণাবেক্ষণকারী টেকনিশিয়ান, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, পরিচর্যাকারী, কৃষক ও লজিস্টিকস অপারেটরের মতো দৈনন্দিন জীবন সচল রাখা পেশাজীবীরা তাঁদের প্রাপ্য স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিতই থেকে যান।

তাই পেশার কারিগরি ও সামাজিক স্বীকৃতির জন্য একটি 'পাবলিক সিস্টেম' বা সরকারি ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হচ্ছে, যা তিনটি বস্তুনিষ্ঠ মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে কাজ করবে: সমষ্টিগত প্রভাব, বিশেষায়নের মাত্রা এবং পরিচালনগত দায়িত্ব। প্রথম মানদণ্ডটি হলো সামগ্রিক প্রভাব: স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, উৎপাদন, অবকাঠামো এবং সামাজিক কল্যাণের ওপর ওই পেশার প্রত্যক্ষ প্রভাব কতটা? দ্বিতীয়টি হলো বিশেষায়নের মাত্রা—যার ক্ষেত্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ, বুদ্ধিবৃত্তিক জটিলতা এবং প্রতিনিয়ত জ্ঞান হালনাগাদ করার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করা হয়। তৃতীয়টি হলো কার্যপরিচালনাগত দায়বদ্ধতা; অর্থাৎ, ওই কাজের সাথে জড়িত মানবিক, কারিগরি বা পদ্ধতিগত ঝুঁকির মাত্রা।

বাস্তবায়নের প্রথম ধাপে পেশাগত গুরুত্বের একটি জাতীয় কাঠামো বা 'ম্যাট্রিক্স' তৈরি করতে হবে, যা কারিগরি পরিষদ, বিশ্ববিদ্যালয়, খাতভিত্তিক প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণে গঠিত হবে। এই কাঠামোটি বেতন-ভাতা সংক্রান্ত নীতিমালা, প্রশিক্ষণ এবং জনশক্তি পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে। এরপর অপরিহার্য ক্ষেত্রগুলোর জন্য জাতীয় বেতন বৃদ্ধি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে; এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকভাবে কম গুরুত্ব পাওয়া পেশাগুলোর জন্য পর্যায়ক্রমিক সমন্বয়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে—বিশেষ করে সেই সব পেশার ক্ষেত্রে, যেগুলোর সামাজিক প্রভাব ব্যাপক কিন্তু অর্থনৈতিক আকর্ষণ কম। তৃতীয় ধাপে পেশাগত উৎকর্ষের সরকারি সনদ প্রদান এবং সামাজিক অর্থায়নে পরিচালিত স্থায়ী 'অব্যাহত শিক্ষা' (continuing education) কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে। এর মাধ্যমে কারিগরি দক্ষতা হালনাগাদ রাখা, প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং প্রকৃত যোগ্যতার ভিত্তিতে পেশাগত অগ্রগতির নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব হবে। সবশেষে, উচ্চ সামাজিক গুরুত্বসম্পন্ন পেশাগুলোর (যার মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক বা অবহেলিত পেশাও অন্তর্ভুক্ত) জন্য প্রতীকী স্বীকৃতির সক্রিয় নীতিমালা প্রস্তাব করতে হবে; এর আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক প্রচারভিযান, সরকারি পুরস্কার প্রদান এবং ওই পেশাগুলোর সামাজিক ভাবমূর্তি বা অবস্থানের ইতিবাচক পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষমতার অধিকারী অভিজাত শ্রেণি যে এই মডেলের বিরোধিতা করবে, তা সহজেই অনুমেয়। যারা প্রতীকী মর্যাদা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রভাব এবং ঐতিহাসিকভাবে অসামঞ্জস্যপূর্ণ উচ্চ পারিশ্রমিক কুক্ষিগত করে রাখার অভ্যস্ত, তারা স্বীকৃতি পুনর্বণ্টন ও বেতন কাঠামো সংশোধনের বিরোধিতা করতে পারে। সংস্কার প্রক্রিয়াকে দুর্বল করতে তারা প্রায়শই এমন সব যুক্তি বা বয়ান ব্যবহার করবে যা সমষ্টিগত জীবনের ওপর প্রকৃত প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন—যেমন কারিগরি শ্রেষ্ঠত্ব, মেধাভিত্তিক বিশেষ অধিকার এবং পেশাগত মর্যাদার প্রথাগত ক্রমবিন্যাস রক্ষা করা। বর্তমান ব্যবস্থা সামাজিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার বিষয়গুলোকে নয়, বরং পুঁজি, দৃশ্যমানতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকা বিষয়গুলোকেই পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়। দৈনন্দিন জীবনের জন্য অপরিহার্য পেশাগুলো এমন সব কাজের তুলনায় কম প্রতীকী ও বস্তুগত স্বীকৃতি পায়, যা হয়তো বৃহত্তর জনকল্যাণে সরাসরি তেমন কোনো ভূমিকা রাখে না। সামাজিক মূল্য এবং স্বীকৃতির মধ্যকার এই বিচ্ছেদ বৈষম্যের একটি কাঠামোগত প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়।

আমাদের অবশ্যই সামাজিক প্রভাব পরিমাপের স্বচ্ছ মানদণ্ড তৈরি করতে হবে, যা সমষ্টিগত জীবন বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজের পদ্ধতিগত গুরুত্বকে বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে সক্ষম। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যখন বুঝতে পারবে কোন পেশাগুলো কার্যকরভাবে সমাজের সংহতি, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং বস্তুগত ধারাবাহিকতা বজায় রাখে, তখনই পরিবর্তনের একটি বৈধ ভিত্তি তৈরি হবে। এরপর, আমাদের মূল্যায়ন নীতিগুলোকে পদ্ধতিগত ঘাটতি এবং সমষ্টিগত প্রয়োজনের সুনির্দিষ্ট প্রমাণের সাথে যুক্ত করতে হবে। অপরিহার্য ক্ষেত্রগুলোতে বেতন কাঠামো পর্যালোচনা, গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রশিক্ষণের জন্য প্রণোদনা, ঐতিহাসিকভাবে উপেক্ষিত পেশাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি এবং কৌশলগত সরকারি পেশাগুলোর পুনর্গঠন—এসব পদক্ষেপ বাজার-কেন্দ্রিক গুরুত্ব ও সামাজিক গুরুত্বের মধ্যকার ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্য দূর করতে শুরু করবে। পেশাগত মূল্যায়নের জন্য আইনি কাঠামো, ন্যায্য পারিশ্রমিকের জন্য সরকারি নীতি এবং বিভিন্ন পেশার সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের নিয়মিত ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে জনমতের চাপকে কাজে লাগাতে হবে। মুনাফার নৈকট্য দিয়ে মর্যাদাকে সংজ্ঞায়িত করার প্রবণতা আমাদের রুখতে হবে। লক্ষ্য সব পেশাকে এক ছাঁচে ফেলা নয়, বরং সামাজিক মূল্য ও স্বীকৃতির মধ্যকার ব্যবধান কমিয়ে আনা। একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমাজের জন্য কেবল মুনাফা সৃষ্টিকারী বিষয় নয়, বরং জীবন ধারণে সহায়ক বিষয়গুলোরও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন।

মর্যাদা, পারিশ্রমিক এবং সামাজিক গুরুত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাটি মেধার বিকাশ এবং কৌশলগত খাতগুলোতে পেশাজীবীদের বণ্টনের ক্ষেত্রে আরও ভালো দিকনির্দেশনা দিতে পারে। এর ফলে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে জনবলের ঘাটতি কমে, সেবার মান উন্নত হয় এবং বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। কারিগরি কাজ তখন কেবল বাজারের স্বীকৃতির ওপর নির্ভর করে না, বরং একটি সামাজিক সম্পদ হিসেবে মূল্যায়িত হয়। একটি পরিপক্ক সমাজ কেবল দৃশ্যমান বিষয়কেই নয়, বরং যা তার বাস্তব অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখে, তাকেও গুরুত্ব দেয়। বিশেষায়িত পেশাগুলো যখন তাদের কাজের গুরুত্বের অনুপাতে স্বীকৃতি পায়, তখন সবার জীবন আরও স্থিতিশীল, দক্ষ ও ন্যায়ভিত্তিক হয়ে ওঠে।

২৭. আবাসন নকশা ও কমিউনিটি ইঞ্জিনিয়ারিং

অস্তিত্বের সবচেয়ে মৌলিক স্থানটিকে যদি কেবল একটি পণ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়—জীবনের আধার হিসেবে নয়—তবে আমরা কীভাবে মানুষের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারি? এই প্রশ্নটি এমন এক বিন্দুর কথা বলে যেখানে বস্তুগত বিষয়, সহাবস্থান এবং ভবিষ্যৎ একে অপরের সাথে মিলিত হয়। আমরা যেভাবে বাড়িঘর ও পাড়া-মহল্লা গড়ে তুলি, তা কেবল শারীরিক আশ্রয়ের বিষয়টিই নির্ধারণ করে না; বরং তা আমাদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, সামাজিক সংযোগ এবং জীবনযাত্রার মানের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে।

বর্তমান সময়ে আবাসন নির্মাণের যে প্রচলিত ধারা বা মডেলটি প্রাধান্য পায়, তাতে মানুষের কল্যাণ ও সামাজিক সংহতির চেয়ে তাৎক্ষণিক খরচ, অর্থনৈতিক ঘনত্ব এবং রিয়েল এস্টেট বা সম্পত্তির মূল্যবৃদ্ধিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর দৈনন্দিন প্রভাব অত্যন্ত গভীর: অপর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা, বিচ্ছিন্ন পাড়া-মহল্লা, সাধারণ বা যৌথ ব্যবহারের জায়গার অভাব এবং অপর্যাপ্ত অবকাঠামো—এসবই মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আবাসন হলো সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ও নগর জীবনের মূল ভিত্তি।

বর্তমান মডেলটির মূল সমস্যা হলো প্রকৌশলবিদ্যা, নগর পরিকল্পনা এবং কমিউনিটি বা সমষ্টিগত জীবনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। এর কারণ হলো এমন সব প্রকল্প যা বিচ্ছিন্নভাবে পরিকল্পনা করা হয় এবং যেখানে একক আবাসন ইউনিট, জমির সর্বোচ্চ মুনাফা এবং 'বর্গমিটার'-কে কেবল আর্থিক মূল্যের মাপকাঠি হিসেবে দেখার প্রবণতা কাজ করে। এর ফলে এমন সব নগর-কাঠামো গড়ে ওঠে যা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন এবং পরিবেশগতভাবে অকার্যকর; এটি সামাজিক বন্ধন দুর্বল করে, জন-অবকাঠামোর খরচ বাড়ায় এবং জীবনযাত্রার মানের ক্রমাবনতি ঘটায়। বাড়ি তো তৈরি হয়, কিন্তু সেই বাড়িকে সচল ও প্রাণবন্ত রাখার মতো মানবিক পরিবেশ গড়ে ওঠে না। এর ফলে এমন এক দৃশ্যপট তৈরি হয় যেখানে মানুষ শারীরিকভাবে কাছাকাছি থাকলেও মানসিকভাবে অনেক দূরে থাকে। এমন পাড়া-মহল্লা যেখানে পারস্পরিক সৌহার্দ্য নেই, এমন শহর

যেখানে আপন করে নেওয়ার অনুভূতি নেই এবং এমন বাসস্থান যা আবহাওয়া থেকে সুরক্ষা দিলেও একাকীত্ব থেকে বাঁচাতে পারে না। আমরা সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, নগর-অনিরাপত্তা, মানুষের মেলামেশার জায়গার অভাব এবং আবাসন ও কমিউনিটির মধ্যকার বিচ্ছেদের শিকার হচ্ছি।

ভবিষ্যতের আবাসন কেবল একটি আশ্রয়স্থল হওয়া উচিত নয়, বরং তা হওয়া উচিত সমষ্টিগত কল্যাণের এক স্থাপত্যশৈলী। এখানে এমন এক সমন্বিত 'কমিউনিটি ইঞ্জিনিয়ারিং' মডেলের কথা বলা হচ্ছে, যেখানে প্রতিটি আবাসন ইউনিটকে জীবন্ত মানবিক বাস্তুতন্ত্র (ecosystem) হিসেবে বিবেচনা করা হবে। ব্যবহারিক দিক থেকে, প্রতিটি আবাসন কমপ্লেক্সের পরিকল্পনার শুরুতেই এমন মডুলার বা পরিবর্তনযোগ্য আবাসিক ইউনিটের ব্যবস্থা থাকা উচিত, যা পরিবারের আকার, জীবনের বিভিন্ন পর্যায় এবং বাসিন্দাদের বিশেষ প্রয়োজনের সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম। এরপর আমাদের এমন সব যৌথ ব্যবহারের জায়গা তৈরি করতে হবে যা বাড়িরই স্বাভাবিক সম্প্রসারণ হিসেবে কাজ করবে—যেমন অভ্যন্তরীণ চত্বর, কমিউনিটি কিচেন বা যৌথ রান্নাঘর, পাড়ার লাইব্রেরি, শিশুদের খেলার জায়গা, পড়াশোনার স্থান, কমিউনিটি গার্ডেন বা যৌথ বাগান এবং বিভিন্ন প্রজন্মের মানুষের মেলামেশার জায়গা। এরপর, আমাদের প্রয়োজন বুদ্ধিমান সম্মিলিত অবকাঠামো। প্রতিটি ইউনিটে জল সংগ্রহ ও পুনঃব্যবহার ব্যবস্থা, স্থানীয় শক্তি উৎপাদন, টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রবেশযোগ্য চলাচল ব্যবস্থা এবং পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল সংযোগ অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। এর বাস্তবায়ন সুস্পষ্ট কয়েকটি ধাপে হওয়া উচিত। প্রথম পর্যায় হলো নগর ও আবাসন বিধিমালার পুনর্গঠন, যেখানে সহাবস্থান, স্থায়িত্ব এবং প্রবেশযোগ্যতার জন্য ন্যূনতম মাপকাঠি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। দ্বিতীয় পর্যায় হলো আঞ্চলিক পাইলট প্রকল্প নির্মাণ, বিশেষ করে নগর সম্প্রসারণ এলাকা এবং অবনমিত অঞ্চলের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে, যা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্ভাব্যতা প্রদর্শন করবে। তৃতীয় পর্যায় হলো প্রকৌশল সমবায়, স্থানীয় সরকারি কনসোর্টিয়াম এবং কমিউনিটি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মডিউলার পদ্ধতিতে এর প্রতিরূপ তৈরি করা।

বর্তমান ব্যবস্থাটি পরিবর্তনের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করে। বড় বড় আবাসন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, জমির ফটকা কারবার বা জল্পনা-কল্পনা-ভিত্তিক মডেল এবং প্রতি খণ্ড জমি থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের মানসিকতায় অভ্যস্ত খাতগুলো—যৌথ ব্যবহারের স্থান, সবুজ এলাকা, সমষ্টিগত সুযোগ-সুবিধা এবং সামাজিক অবকাঠামো সম্প্রসারণের

বিরোধিতা করবে। তারা এগুলোর মাধ্যমে মুনাফার হার তাৎক্ষণিকভাবে কমে যাওয়ার আশঙ্কা করে। এর ফলে মাস্টার প্ল্যান বা মহাপরিকল্পনার ওপর চাপ সৃষ্টি হবে, নগর পরিকল্পনার নীতিমালায় সুবিধামতো নমনীয়তা আনার চেষ্টা চলবে এবং শুধুমাত্র জমির আর্থিক মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা ঘনবসতিপূর্ণ আবাসন মডেলের পক্ষে জোরদার অবস্থান নেওয়া হবে। নগর এলাকাকে এখানে মানুষের বসবাসের উপযোগী পরিবেশ হিসেবে নয়, বরং মুনাফা অর্জনকারী সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আবাসনকে একটি বিচ্ছিন্ন পণ্য হিসেবে দেখা হয়; অথচ এটি এমন এক মানবিক বাস্তুতন্ত্রের অংশ হওয়া উচিত, যেখানে সহাবস্থান, নিরাপত্তা, চলাচলের সুবিধা, একে অপরের প্রতি যত্ন এবং আপন করে নেওয়ার বা একাত্মবোধের বিষয়টি জড়িত। তাই এই ব্যবস্থার প্রতিরোধ কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং সাংস্কৃতিকও বটে; কারণ এটি বিচ্ছিন্ন এবং মানসিকভাবে ক্লান্তিকর শহর ব্যবস্থাকেই স্বাভাবিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

পরস্পর সংযুক্ত তিনটি কৌশলের মাধ্যমে এই প্রতিরোধ ভাঙতে হবে: স্মার্ট নগর নীতিমালা, প্রগতিশীল কর-প্রণোদনা এবং সুসংগঠিত সামাজিক চাপ। প্রথম পদক্ষেপটি হলো স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কমিউনিটি বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা—যেমন নগর পরিষদ গঠন, বাধ্যতামূলক গণশুনানি এবং প্রকল্প প্রণয়নে পরিবারগুলোর সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। যখন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তাদের বসবাসের স্থানের নকশা বা পরিকল্পনায় প্রভাব ফেলতে শুরু করে, তখন শহরটি আর ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো পণ্য থাকে না, বরং মানুষের প্রকৃত চাহিদার প্রতিফলন হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় পদক্ষেপটি হওয়া উচিত নির্মাণশৈলী বা মডেল পরিবর্তনের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে। পৌরসভাগুলো টেকসই সামাজিক প্রকল্প, মিশ্র ভূমি ব্যবহার (যেখানে একই এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারের সুযোগ থাকে), সাধারণ বা যৌথ ব্যবহারের জায়গাসহ আবাসন, নগর-উদ্যান, বসবাসযোগ্য পরিবেশ এবং পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ও পানি ব্যবস্থাপনার জন্য কর-সুবিধা চালু করতে পারে। একই সাথে, নগর পরিকল্পনার নতুন নীতিমালায় সহাবস্থান, প্রবেশগম্যতা, পরিবেশগত দক্ষতা এবং সামাজিক একাত্মতার মতো বিষয়গুলোকে বাধ্যতামূলক করা উচিত। একটি চত্বর, একটি কমিউনিটি সেন্টার কিংবা মানুষের চলাচলের উপযোগী করে পরিকল্পিত একটি রাস্তা—এসবই পরবর্তী বড় পরিসরের পরিবর্তনের জন্য ভিত্তি বা দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করে। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সাংস্কৃতিক পরিবর্তন: সমাজকে এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে মানুষ আবারও মানবিক শহরের আকাঙ্ক্ষা করে। শহরের

রূপান্তর তখনই স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে, যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বৈরী বা প্রতিকূল শহরের যুক্তি প্রত্যাখ্যান করে এবং আপন করে নেওয়ার অনুভূতি, নৈকট্য ও উন্নত জীবনযাত্রার মানকে কাঠামোগত অধিকার হিসেবে দাবি করতে শুরু করে। এভাবেই আবাসনের নকশা কেবল স্থাপত্যশৈলীর বিষয় না থেকে সামাজিক, পরিবেশগত ও কার্যকারিতা-ভিত্তিক এক উদ্যোগে পরিণত হয়।

ঠিক এখানেই ভবিষ্যতের রূপটি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। কেবল বড় শহর নয়, বরং উন্নত ও ভালো শহর। কেবল ঘরবাড়ি নয়, বরং গড়ে ওঠে একাত্মবোধসম্পন্ন কমিউনিটি বা সমাজ। কেবল অবকাঠামো নয়, বরং নিশ্চিত হয় আরও মর্যাদাপূর্ণ, নিরাপদ ও সুখী জীবন। নতুন সেই পৃথিবীর সূচনা হয় ঠিক তখনই, যখন মানুষ তাদের বসবাসের জায়গার সাথে আবারও এক গভীর আত্মিক বন্ধন বা আপনত্বের অনুভূতি অনুভব করতে শুরু করে। সামাজিক মেলবন্ধনের কথা মাথায় রেখে পরিকল্পিত আবাসন সামাজিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করে, শহরের বিচ্ছিন্নতা কমায় এবং নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার মান উন্নত করে। যৌথ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কমায়, প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং জ্বালানি সাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। মডুলার বা পরিবর্তনযোগ্য কাঠামোর ফলে আবাসন ব্যবস্থা পরিবারের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও স্থানীয় চাহিদার সাথে মানিয়ে নিতে পারে, যা শহরকে আরও প্রাণবন্ত ও স্থিতিস্থাপক করে তোলে। এই পর্যায়ের মূল ভাবনাটি এই উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে যে, বাসস্থান মানে কেবল কোনো স্থানে অবস্থান করা নয়; বরং এটি একাত্মবোধ, সংস্কৃতি ও ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার বিষয়। যখন প্রকৌশলগত পরিকল্পনা সামাজিক জীবনযাত্রার দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন আবাসন কেবল একটি আশ্রয়ের গণ্ডি পেরিয়ে আরও মানবিক, টেকসই ও সমন্বিত এক সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ হয়ে ওঠে।

২৮. সমষ্টিগত বা কমিউনিটি-ভিত্তিক সেবা

অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য এই বিষয়টিকে যদি সমষ্টিগত জীবনের স্থায়ী ভিত্তি হিসেবে না দেখে কেবল অসুস্থতার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে আমরা কীভাবে সত্যিই মর্যাদাপূর্ণ এক মানবিক ভবিষ্যতের কথা ভাবতে পারি? একটি সমাজ যেভাবে সেবা বা পরিচর্যার ব্যবস্থা গড়ে তোলে, তা কেবল মানুষের গড় আয়ুকেই নয়, বরং প্রতিদিনের জীবনযাপনের গুণমানকেও নির্ধারণ করে।

বর্তমান স্বাস্থ্যসেবা মডেলটি সমস্যা গুরুতর হওয়ার পরের পদক্ষেপ বা হস্তক্ষেপের ওপর বেশি জোর দেয়। এতে হাসপাতাল-কেন্দ্রিক কাঠামো, জরুরি চিকিৎসা এবং উচ্চ-বিশেষায়িত সেবাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়; অথচ রোগ প্রতিরোধ, মানসিক স্বাস্থ্য এবং জনগোষ্ঠীর অবস্থার ওপর ধারাবাহিক নজরদারির বিষয়গুলো উপেক্ষিত থেকে যায়। এর ফলে দীর্ঘ লাইন, সেবা পেতে বিলম্ব, স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ ও ভৌগোলিক বৈষম্যের মতো সমস্যা তৈরি হয়। পাশাপাশি মানসিক চাপ, অপুষ্টি, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং অনিশ্চিত আবাসন ও কর্মপরিবেশের কারণে নীরব অসুস্থতাও বাড়তে থাকে। স্বাস্থ্য হলো সেই ভিত্তি যার ওপর শিক্ষা, কর্মসংস্থান, পারস্পরিক সহাবস্থান এবং ভবিষ্যতের আশা—সবকিছুই টিকে থাকে।

বর্তমান মডেলের মূল সমস্যাটি হলো রোগ প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং সমষ্টিগত জীবনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা। এর কারণ হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা বিচ্ছিন্ন বিশেষায়িত বিভাগ, অসম সুযোগ এবং কেবল সমস্যা-পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার (রিঅ্যাক্টিভ) মানসিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এর ফলে রোগ আগে থেকে আঁচ করা, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর ওপর নজর রাখা এবং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা কঠিন হয়ে পড়ে। দিনশেষে দেখা যায় সেবার ওপর অতিরিক্ত চাপ, প্রতিরোধযোগ্য স্বাস্থ্যসমস্যার অবনতি এবং জীবনযাত্রার মানের অধোগতি। রোগের চিকিৎসা করা হয় ঠিকই, কিন্তু যে জীবনধারা বা পরিস্থিতির কারণে রোগটি সৃষ্টি হয়েছে, তার প্রতি সবসময় যথাযথ যত্ন নেওয়া হয় না।

তাই একটি সমন্বিত কমিউনিটি স্বাস্থ্য মডেলের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। এই মডেলটি রোগ প্রতিরোধ ও ধারাবাহিক নজরদারির স্থানীয় নেটওয়ার্ক এবং চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শারীরিক কার্যকলাপ ও পরিবেশগত পরিস্থিতির মধ্যে সমন্বয়ের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, প্রতিটি এলাকা, কমিউনিটি বা শহুরে কেন্দ্রে সমন্বিত সেবা কেন্দ্র থাকা উচিত; যা আঞ্চলিক হাসপাতাল, স্কুল, খেলাধুলার সুবিধা এবং সামাজিক সহায়তা ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকবে। এই কেন্দ্রগুলো নিয়মিত প্রতিরোধমূলক সেবা, পারিবারিক স্বাস্থ্য-পর্যবেক্ষণ, মানসিক সহায়তা, পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ, শারীরিক ব্যায়ামের কর্মসূচি এবং সুস্থতার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে এমন পরিবেশগত বিষয়গুলোর ওপর নজরদারি নিশ্চিত করবে।

এই মডেল বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হলো প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার পরিধি বাড়ানো। এর জন্য এলাকা-ভিত্তিক বহু-বিভাগীয় দল (মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি টিম) গঠন করতে হবে, যেখানে চিকিৎসক, নার্স, মনোবিজ্ঞানী, পুষ্টিবিদ, সমাজকর্মী এবং কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন। দ্বিতীয় ধাপটি হলো স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত তথ্যের ডিজিটাল সমন্বয় সাধন করা, যা ধারাবাহিক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন-মাফিক নজরদারি সম্ভব করে তুলবে—অবশ্যই নৈতিক তথ্য সুরক্ষা এবং মানুষের তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করার মাধ্যমে। তৃতীয় ধাপে জনকল্যাণ ও সুস্থতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়; এর মধ্যে রয়েছে রোগ প্রতিরোধমূলক প্রচারণা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, কায়িক শ্রমহীন বা নিষ্ক্রিয় জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ, মানসিক স্বাস্থ্যের সহায়তা এবং শিশু ও বয়স্কদের যত্ন নেওয়া। সম্প্রদায়-ভিত্তিক কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় হাসপাতালে ভর্তির হার কমায়, রোগ প্রতিরোধের সক্ষমতা বাড়ায়, কাঠামোগত ব্যয় হ্রাস করে এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করে। শরীর, মন ও পরিবেশের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা কেবল সংকট মোকাবিলার গণ্ডি পেরিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে শুরু করে।

এটা স্পষ্ট যে বর্তমান কাঠামোটি এই রূপান্তরের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, কেবল রোগ নিরাময়-কেন্দ্রিক মানসিকতার সাথে জড়িত অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং খণ্ডিত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি—এসবই প্রতিরোধ ও ধারাবাহিক সেবার ওপর গুরুত্বারোপকারী ব্যবস্থায় উত্তরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। এই প্রতিরোধের মূলে রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক বিচ্ছিন্নতা, প্রশাসনিক কাজের অত্যধিক চাপ, রোগের চূড়ান্ত পর্যায়ে বা অনেক দেরিতে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পদের কেন্দ্রীকরণ এবং এমন সব আর্থিক কাঠামো বজায় রাখা যা রোগ প্রতিরোধের চেয়ে প্রতিষ্ঠিত রোগের চিকিৎসায় বেশি মুনাফা করে। স্বাস্থ্যব্যবস্থাটি মূলত একটি সংকট-ভিত্তিক বা 'ধসে পড়ার উপক্রম' পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়: এটি সেবা প্রদান করে তখনই, যখন সংকট ঘনীভূত হয়ে গেছে, রোগ অনেক দূর এগিয়েছে এবং মানুষের ভোগান্তি একটি ব্যাপক সামাজিক ব্যয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা, মানসিক স্বাস্থ্য, পারিবারিক সেবা, প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং স্থানীয় পর্যায়ে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, তা দেরিতে ব্যবস্থা নেওয়ার সেই মানসিকতাকেই আরও জোরদার করে—যা মানুষের মর্যাদা ও সেবার দক্ষতাকে ক্ষুণ্ণ করে।

ধারাবাহিক সরকারি বিনিয়োগ, সমন্বিত কাজের জন্য পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয় সেবার অগ্রাধিকার নির্ধারণে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। প্রথম পদক্ষেপটি হলো ব্যবস্থার স্থানীয় ভিত্তি বা কাঠামোকে শক্তিশালী করা—যার মধ্যে থাকবে বহু-বিভাগীয় (multidisciplinary) দল, স্থানীয় পর্যায়ে স্থায়ী উপস্থিতি এবং জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা। সেবা যখন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাছাকাছি পৌঁছায়, তখন কেবল জরুরি চিকিৎসার ওপর নির্ভরতা কমে আসে। দ্বিতীয় ধাপটি হওয়া উচিত প্রতিরোধ, চিকিৎসা এবং সামাজিক পর্যবেক্ষণের পর্যায়ক্রমিক সমন্বয়ের মাধ্যমে। প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য কর্মসূচি, সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সমন্বয়, সুস্থতা বিষয়ক শিক্ষা এবং স্কুল ও সামাজিক পরিসরের সাথে সংযোগ স্থাপন—এসবই ধাপে ধাপে স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে কেবল 'প্রতিক্রিয়াশীল' (সমস্যা হওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়া) অবস্থা থেকে 'পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক' (সমস্যা হওয়ার আগেই ব্যবস্থা নেওয়া) অবস্থায় উন্নীত করে। প্রতিটি পদক্ষেপের মাধ্যমেই রোগের জটিলতা হ্রাস, জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন এবং পেশাজীবী ও সম্প্রদায়ের মধ্যকার বন্ধন সুদৃঢ় হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হতে হবে।

তবে সবচেয়ে নির্ণায়ক বিষয়টি হলো সামাজিক অংশগ্রহণ। যখন স্থানীয় সেবার অগ্রাধিকার নির্ধারণে সম্প্রদায় সহায়তা করে, তখন স্বাস্থ্যব্যবস্থা কেবল একটি প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে সীমাবদ্ধ না থেকে মানবিক হয়ে ওঠে এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার বাস্তব পরিস্থিতির প্রতি সংবেদনশীল হয়ে ওঠে। আমাদের আশার উৎস হলো এই উপলব্ধি যে, স্বাস্থ্য মানে কেবল রোগের অনুপস্থিতি নয়; বরং এটি ভারসাম্য, যত্ন, প্রতিরোধ এবং মর্যাদার উপস্থিতি। সমাজ যখন সংকট বা বিপর্যয়ের আগেই জীবনের সুরক্ষায় ও সেবায় এগিয়ে আসে, তখন ভবিষ্যৎ কেবল টিকে থাকার লড়াইয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে মানবিক পরিপূর্ণতার পথে ধাবিত হয়।

২৯. প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল পর্যটন

পৃথিবীটাকে দেখার বা ঘুরে বেড়ানোর যোগ্য করে তোলে যে বিষয়গুলো, সেগুলোকে ধ্বংস না করেই আমরা কীভাবে বিশ্বকে অন্বেষণ করতে পারি? মানুষের এক সচেতন ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ভ্রমণের অর্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য বা পরিবেশকে কেবল ভোগ করা নয়, বরং তাদের সাথে সহাবস্থান করতে

শেখা। স্থানচ্যুতি, সংস্কৃতি এবং পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্ককে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন, যাতে মানুষের আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা পরিবেশগত অবক্ষয়ে পরিণত না হয়।

বর্তমান সময়ে পর্যটন স্থানীয় অর্থনীতিকে সচল রাখে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও অঞ্চলের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বাড়ায়। আয়, অবকাঠামো এবং দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রভাব ফেলার মাধ্যমে পর্যটন স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটক—উভয়ের জন্যই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে অপরিকল্পিত পর্যটন অতিরিক্ত ভিড়, সাংস্কৃতিক বিকৃতি, অত্যধিক বর্জ্য সৃষ্টি এবং ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রের ওপর চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমান মডেলের সমস্যাটি নিহিত রয়েছে 'গণ-পর্যটন' (mass tourism) এবং প্রাকৃতিক স্থানের নির্বিচার শোষণের যুক্তির মধ্যে। পর্যটকদের অত্যধিক সমাগম, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো এবং পরিবেশ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সীমার অভাব—এসবই সমস্যার মূল কারণ; আর সংখ্যা বা পরিমাণের ওপর জোর দেওয়া এবং তাৎক্ষণিক মুনাফা অর্জনের ব্যবসায়িক মডেল পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্রেইল, নদী, সমুদ্রসৈকত, বন এবং সংরক্ষিত এলাকাগুলোর অবক্ষয় ঘটছে, যার ফলে সেই প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে যা পর্যটন কার্যক্রমকে টিকিয়ে রাখে। প্রকৃতিকে গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে বর্তমান মডেলটি তাকে ক্ষয় করছে। অনন্য সৌন্দর্যের স্থানগুলো অনেক সময় তাদের নিজেদের জনপ্রিয়তারই শিকার হয়: বর্জ্যে পূর্ণ সৈকত, ক্ষয়ে যাওয়া হাঁটার পথ (ট্রেইল), দূষিত ঝর্ণা, বাস্তুচ্যুত বন্যপ্রাণী এবং অপর্যাপ্ত অবকাঠামো ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির চাপে পিষ্ট স্থানীয় জনগোষ্ঠী—এসবই এর উদাহরণ। যা মানুষের সাথে প্রকৃতির নৈকট্য বাড়ানোর কথা ছিল, তা-ই উল্টো প্রকৃতির অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করছে।

পর্যটনের ভবিষ্যৎ হতে পারে মানুষের উপস্থিতি এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের মধ্যে এক মেলবন্ধনের ভবিষ্যৎ। পরিবেশের ধারণক্ষমতা, নিয়ন্ত্রিত রুট বা পথ এবং স্থানীয় পর্যায়ে বাধ্যতামূলক পুনর্বিনিয়োগের ওপর ভিত্তি করে একটি 'পুনরুৎপাদনশীল' (regenerative) পর্যটন ব্যবস্থা ও পরিবেশের ওপর কম প্রভাব ফেলে এমন অভিযানের পক্ষে মত দেওয়া হচ্ছে। এর প্রথম ভিত্তি বা স্তম্ভটি হলো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের সর্বোচ্চ ব্যবহারের সক্ষমতা। প্রতিটি প্রাকৃতিক এলাকায় দৈনিক দর্শনার্থীর সর্বোচ্চ সংখ্যা নির্ধারণ করা উচিত; আর এই সংখ্যাটি নির্ধারিত হবে পরিবেশগত সহনক্ষমতা, বায়োমের

সংবেদনশীলতা, ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন এবং অবক্ষয়ের ঝুঁকির ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত কারিগরি গবেষণার মাধ্যমে। দ্বিতীয় ভিত্তিটি হলো বুদ্ধিদীপ্ত প্রবেশাধিকার ব্যবস্থাপনা—যার মধ্যে রয়েছে আগে থেকে ডিজিটাল সময়সূচি নির্ধারণ, রিয়েল-টাইম বা তাৎক্ষণিক পর্যবেক্ষণ এবং ট্রেইল, সৈকত, নদী ও সংরক্ষিত এলাকায় পর্যটকদের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ। এর ফলে সময়ের সাথে সাথে দর্শনার্থীদের আগমন ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, অতিরিক্ত ভিড় এড়ানো যায় এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলোকে রক্ষা করা যায়। তৃতীয় ভিত্তিটি হলো সুনির্দিষ্ট রুট ও নির্দেশিত অভিজ্ঞতার কাঠামো তৈরি করা; যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে চিহ্নিত হাঁটার পথ, নিয়ন্ত্রিত পর্যবেক্ষণ এলাকা এবং সনদপ্রাপ্ত স্থানীয় গাইডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ভ্রমণ বা অভিযান। এখানে পর্যটন আর কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত অনুপ্রবেশ বা আগ্রাসন নয়, বরং তা হয়ে ওঠে এক শিক্ষণীয়, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত অভিজ্ঞতা।

এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হওয়া উচিত। প্রথম ধাপে রয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশগত ও সাংস্কৃতিক মানচিত্র তৈরি করা এবং এর পাশাপাশি ব্যবহারের সীমা, সংবেদনশীল এলাকা ও পর্যটনের জন্য উপযুক্ত অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করা। দ্বিতীয় ধাপে রয়েছে সময়সূচি নির্ধারণ ও দর্শনার্থী চলাচলের নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি ও সম্প্রদায়-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা। তৃতীয় ধাপে স্থানীয় গাইড, পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষাবিদ এবং এলাকার রক্ষকদের নিয়ে একটি স্থানীয় নেটওয়ার্ক গঠন করা; যেখানে স্থানীয় বাসিন্দা, ঐতিহ্যবাহী জনগোষ্ঠী এবং সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞরা একে অপরের সাথে যুক্ত থাকবেন। এই প্রস্তাবনার একটি অপরিহার্য অংশ হলো স্থানীয় পর্যায়ে বাধ্যতামূলকভাবে আয়ের পুনর্বিনিয়োগ। পর্যটন থেকে অর্জিত আয়ের একটি অংশ বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী পরিবেশ সংরক্ষণ, স্থানীয় পরিচ্ছন্নতা ব্যবস্থা, চলাচলের পথ বা ট্রেইল রক্ষণাবেক্ষণ, পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা এবং এলাকার রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী জনগোষ্ঠীর ন্যায্য পারিশ্রমিকের জন্য বরাদ্দ করতে হবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যারা প্রকৃতিকে রক্ষা করেন, প্রকৃতি থেকে সৃষ্ট সম্পদের সুফল ভোগের ক্ষেত্রেও তাঁদের ন্যায্য অংশগ্রহণ থাকা আবশ্যক।

বড় ট্যুর অপারেটর, মধ্যস্থতাকারী প্ল্যাটফর্ম এবং গণ-পর্যটন-নির্ভর খাতগুলো দর্শনার্থী সংখ্যা সীমিত করা, সংবেদনশীল এলাকা রক্ষা এবং সংরক্ষণের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ পুনর্বিনিয়োগের বিষয়গুলোর বিরোধিতা করতে পারে। তারা

নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধ শিথিল করা, লাইসেন্সিং সহজ করা, পরিবেশগত ধারণক্ষমতার অতিরিক্ত পর্যটক প্রবাহকে উৎসাহিত করা এবং পর্যটন গন্তব্যগুলোর নিবিড় বা অত্যধিক ব্যবহারের মডেলকে টিকিয়ে রাখার পক্ষে চাপ সৃষ্টি করবে। তখন সংশ্লিষ্ট এলাকাটি আর কোনো জীবন্ত বাস্তুতন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয় না, বরং দ্রুত ভোগের একটি পণ্যে পরিণত হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যপট, স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং প্রাকৃতিক ঐতিহ্যকে কেবল অর্থনৈতিক লেনদেনের কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, অথচ তাদের সংরক্ষণের জন্য কোনো আনুপাতিক সুফল বা বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হয় না। প্রকৃতি তখন আর মানুষের অভিজ্ঞতার ধারক কোনো জীবন্ত কাঠামো হিসেবে নয়, বরং কেবল একটি পটভূমি বা দৃশ্যপট হিসেবে গণ্য হয়।

দৃঢ় পরিবেশগত নীতিমালা, পুনরুদ্ধারমূলক বা 'রিজেনারেটিভ' পর্যটনের জন্য সরকারি সনদ এবং নৈতিক ও টেকসই অভিজ্ঞতার প্রত্যাশী সচেতন ভোক্তাদের ক্রমবর্ধমান চাপের মাধ্যমে এই বাধা অতিক্রম করতে হবে। প্রথম পদক্ষেপটি হলো প্রাকৃতিক এলাকা, ট্রেইল, পার্ক এবং পরিবেশগতভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল গন্তব্যগুলোর জন্য স্পষ্ট 'ধারণক্ষমতা' (carrying capacity) বা দর্শনার্থী সংখ্যার সীমা নির্ধারণ করা। যখন কোনো এলাকার প্রকৃত ধারণক্ষমতা অনুযায়ী পর্যটক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তখন পরিবেশের ওপর ক্রমপুঞ্জিত ক্ষতিকর প্রভাব কমে এবং পর্যটনের অভিজ্ঞতার মান উন্নত হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপটি হওয়া উচিত বাধ্যতামূলক পুনর্বিনিয়োগ এবং স্থানীয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে। সংরক্ষণ-সংশ্লিষ্ট পরিবেশ কর, কমিউনিটি তহবিল, টেকসই অপারেটরদের জন্য সরকারি সনদ এবং নিয়মিত প্রভাব নিরীক্ষা—এসব পদক্ষেপ পর্যটনকে পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে অর্থনৈতিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলে। প্রতিটি নতুন ব্যবস্থাকেই এটি প্রমাণ করতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট এলাকা বা ভূখণ্ডকে রক্ষা করা হলে দীর্ঘমেয়াদে তার স্থায়িত্ব ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এরপর, ভ্রমণের ধারণার মধ্যেই একটি সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনা জরুরি হয়ে পড়ে। সামাজিক চাপ এবং ভোক্তা সচেতনতার মাধ্যমে চাহিদার ধরন পরিবর্তন করতে হবে: ভোগবাদী পর্যটন কমিয়ে তার পরিবর্তে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, জ্ঞানার্জন ও গভীর উপলব্ধিনির্ভর পর্যটনকে উৎসাহিত করতে হবে। যখন অধিকাংশ মানুষ কেবল স্থান দখল বা ভোগের পরিবর্তে অর্থবহ অভিজ্ঞতার আকাঙ্ক্ষা করতে শুরু করবে, তখন বাজারের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাও পরিবর্তিত হবে।

ভবিষ্যতের পর্যটন মানে কোনো স্থানকে কেবল ভোগ করা নয়, বরং তার মধ্যে গভীর অর্থ খুঁজে পাওয়া। প্রকৃতি তখন আর শোষণের পটভূমি হিসেবে নয়, বরং মানুষের কল্যাণ সাধনে এক অংশীদার হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রকৃত ভবিষ্যৎ মানে পৃথিবীকে ধ্বংস করা পর্যন্ত কেবল ভ্রমণ করে যাওয়া নয়, বরং একে এমনভাবে জানা ও বোঝা যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও এটি সজীব ও অক্ষুণ্ণ থাকে। পর্যটক প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ পরিবেশগত অবক্ষয় কমায়, দর্শনার্থীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করে এবং বাস্তুতন্ত্রের অখণ্ডতা রক্ষা করে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আঞ্চলিক অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে, ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের মূল্যায়ন করে এবং পর্যটন ও পরিবেশ সুরক্ষার মধ্যে একটি সেতুবন্ধন তৈরি করে। পর্যটন যখন প্রকৃতির ছন্দ ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে, তখন তা আর কোনো হুমকি হয়ে থাকে না; বরং সচেতনতা ও সংরক্ষণ এবং একটি যৌথ ভবিষ্যতের বাহন হয়ে ওঠে।

৩০. সবার জন্য খেলাধুলা ও বিনোদন

একটি সমাজ কীভাবে মানুষের পূর্ণাঙ্গ ভবিষ্যতের কথা বলতে পারে, যদি শারীরিক সক্রিয়তা, অবসর ও সংস্কৃতির সুযোগ কেবল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের বিশেষাধিকার হয়েই থাকে? মর্যাদাপূর্ণ জীবন কেবল বস্তুগতভাবে টিকে থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এর জন্য প্রয়োজন সুস্বাস্থ্য, আত্মপ্রকাশের সুযোগ, সহাবস্থান এবং সম্মিলিত আনন্দ। এই বিষয়গুলোতে সবার সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার অর্থ হলো এটি স্বীকার করা যে, সামগ্রিক কল্যাণ শরীর, মন এবং সামাজিক চেতনার ওপর নির্ভরশীল।

বর্তমানে দৈনন্দিন জীবনে খেলাধুলা ও বিনোদনের গভীর প্রভাব রয়েছে। খেলাধুলা শারীরিক স্বাস্থ্য, শৃঙ্খলাবোধ, পারস্পরিক সহযোগিতা ও রোগ প্রতিরোধের সক্ষমতা বাড়ায়; অন্যদিকে বিনোদন মানুষের কল্পনাশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে, মানসিক প্রশান্তি দেয় এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটায়। কিন্তু এই সুযোগের বণ্টনে রয়েছে চরম বৈষম্য। অনেক এলাকায় খেলার মাঠ, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, খেলাধুলার জন্য নিরাপদ স্থান এবং সবার জন্য উন্মুক্ত অনুষ্ঠানের অভাব রয়েছে। অবসর ও শারীরিক সক্রিয়তার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে সামাজিক, শিক্ষাগত এমনকি জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও বৈষম্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

বর্তমান মডেলের মূল সমস্যা হলো এই সুযোগগুলোর পণ্যকরণ। এর কারণ হলো খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর অবস্থান মূলত শহরের কেন্দ্রস্থল বা অভিজাত এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকা এবং এতে অংশগ্রহণের জন্য অত্যধিক ভোগ-বিলাসের ওপর নির্ভরতা। খেলার মাঠ, ক্রীড়া কেন্দ্র, সিনেমা হল, থিয়েটার, লাইব্রেরি এবং সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের স্থানগুলো সুবিধাজনক বা অভিজাত এলাকায় কেন্দ্রীভূত; ফলে জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিকভাবে এসব সুযোগ-সুবিধা থেকে অনেক দূরে থেকে যায়। এর ফলে সমাজের একটি বড় অংশ—বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশু, তরুণ ও বয়স্করা—এসব স্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এর পরিণামে দেখা দেয় কায়িক শ্রমহীন জীবনযাপন, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং মানবিক বিকাশ ও সামাজিক সংহতির সুযোগ হারানো। এই মডেলে অবসর আর কোনো অধিকার থাকে না, বরং পণ্যে পরিণত হয়। যখন খেলাধুলা ও সংস্কৃতির সুযোগ আয়-উপার্জনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখন শরীর, মন ও সমষ্টিগত জীবনেও সেই বৈষম্যের প্রতিফলন ঘটতে থাকে। এর ফলে নিরাপদ মিলনস্থলের অভাবে তরুণদের হতাশা, ক্রীড়া প্রতিভার বিকাশ না ঘটা, শৈল্পিক সৃজনশীলতা রুদ্ধ হওয়া এবং উৎসব ও একাত্মবোধের মুহূর্তহীন এক সমাজব্যবস্থা গড়ে ওঠে।

যে সমাজ সমষ্টিগত কল্যাণের কথা ভাবে, তারা বোঝে যে খেলাধুলা ও বিনোদনকে বিলাসিতা হিসেবে দেখা যায় না; বরং এগুলো শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক স্বাস্থ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই পাড়া-মহল্লা, শহর ও জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনের সাথে একীভূত করে 'কমিউনিটি স্পোর্টস অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট'-এর একটি সর্বজনীন নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হচ্ছে। এর প্রথম ধাপ বা ভিত্তি হলো স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সরকারি অবকাঠামো গড়ে তোলা। এর অর্থ হলো বহুমুখী ক্রীড়াকেন্দ্র, উন্মুক্ত খেলার মাঠ, হাঁটার পথ, সুসজ্জিত চত্বর, সবার জন্য প্রবেশযোগ্য পার্ক, কমিউনিটি সুইমিং পুল এবং ফুটবল থেকে শুরু করে জিমন্যাস্টিকস, মার্শাল আর্ট ও নাচের মতো বিভিন্ন খেলার জন্য নির্দিষ্ট স্থান গড়ে তোলা। পাশাপাশি প্রয়োজন প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক অবকাঠামো: যেমন—সক্রিয় কমিউনিটি লাইব্রেরি, জনপ্রিয় সিনেমা হল, স্থানীয় থিয়েটার, সঙ্গীত মিলনায়তন, শিক্ষামূলক গেম সেন্টার এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছাতে সক্ষম ভ্রাম্যমাণ সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা। তৃতীয় দিকটি হলো বিনামূল্যে এবং নিয়মিত সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রমের আয়োজন। কেবল অবকাঠামো নির্মাণই যথেষ্ট নয়, সেগুলোকে প্রাণবন্ত ও কর্মচঞ্চল করে তোলাও জরুরি। সব বয়সের মানুষের জন্য

নিয়মিত কার্যক্রমের একটি তালিকা বা সময়সূচি প্রস্তাব করা হচ্ছে, যার মধ্যে থাকবে কর্মশালা, উৎসব, প্রতিযোগিতা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, সান্ধ্যকালীন আসর, স্থানীয় পরিবেশনা, শিশুদের জন্য নানা আয়োজন এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিশেষ কর্মসূচি।

প্রথমেই আমাদের এমন এলাকাগুলো চিহ্নিত করতে হবে যেখানে বিনোদন ও খেলাধুলার সুযোগ-সুবিধার সবচেয়ে বেশি ঘাটতি রয়েছে। এরপর, শহরের প্রান্তিক এলাকা এবং ঐতিহাসিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলগুলোতে কমিউনিটি সেন্টার বা সামাজিক কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। তৃতীয় ধাপে স্থানীয় পেশাজীবীদের নিয়ে একটি নেটওয়ার্ক বা সংযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে; এই দলে থাকবেন শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, ক্রীড়াবিদ, সাংস্কৃতিক সমন্বয়কারী এবং কমিউনিটি শিক্ষকরা। এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ: এই নতুন মডেলটি কেবল সুযোগ-সুবিধাই নিশ্চিত করে না, বরং কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কাজের স্বীকৃতি এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রতি একাত্মবোধ বা আপন করে নেওয়ার অনুভূতিও জাগিয়ে তোলে।

অর্থের বিনিময়ে উপভোগ্য বিনোদনের বিশেষ সুবিধা, অবসর সময়কে পণ্যে রূপান্তর এবং বিশাল সব সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া স্থাপনা নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় কেন্দ্রীভূত করার সাথে জড়িত ব্যক্তিস্বার্থগুলো সর্বজনীন প্রবেশাধিকারের প্রসারের বিরোধিতা করবে—বিশেষ করে যখন তা বর্জন বা সীমাবদ্ধতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মুনাফার সুযোগ কমিয়ে দেয়। একইভাবে, যেসব নগর-পরিকল্পনা কেবল অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার ওপর গুরুত্ব দেয়, সেগুলো অবসর সময়কে মানুষের জীবন ও সামাজিক সংহতির অপরিহার্য অংশ হিসেবে না দেখে বরং একটি গৌণ বিষয় হিসেবে গণ্য করে। শহরের স্থানিক বিন্যাসের মধ্যেও এই বিরোধিতার প্রতিফলন দেখা যায়—যেমন যখন শহরের চত্বর, আবাসিক ব্লক, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং সামাজিক মেলামেশার স্থানগুলোকে অবহেলা করা হয়। তখন শহরটি এমন বার্তা দিতে শুরু করে যে, নাগরিকের অস্তিত্ব কেবল উৎপাদন ও আদান-প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের জন্য নয়। মানুষের মিলিত হওয়ার মতো স্থানের অভাব বিচ্ছিন্নতা, সামাজিক বিভাজন এবং সমষ্টিগত ক্লান্তিকে ত্বরান্বিত করে।

ধারাবাহিক সরকারি বিনিয়োগ, সম্প্রদায়ের সাথে অংশীদারিত্ব এবং স্থান ব্যবস্থাপনায় জোরালো সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে হবে। অবসর, খেলাধুলা ও সংস্কৃতিকে নগর-নীতির কাঠামোগত উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি

দেওয়া জরুরি; যার জন্য থাকবে নিজস্ব বাজেট, সুনির্দিষ্ট আঞ্চলিক লক্ষ্য এবং শহরের কেন্দ্র ও প্রান্তিক এলাকার মধ্যে সুষম বণ্টন ব্যবস্থা। দ্বিতীয় ধাপে ধাপে গড়ে তুলতে হবে বিভিন্ন সামাজিক অবকাঠামো—যেমন উন্মুক্ত খেলার মাঠ, স্থানীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, 'লিভিং লাইব্রেরি' বা জীবন্ত পাঠাগার, সবার জন্য উন্মুক্ত পার্ক এবং সঙ্গীত, নাটক ও পারস্পরিক মেলামেশার স্থান। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সমষ্টিগত ব্যবস্থাপনা। যখন কোনো সম্প্রদায় এসব পরিবেশ গড়ে তুলতে, রক্ষণাবেক্ষণ করতে এবং কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা করে, তখন সেই স্থানটি কেবল 'সরকারি' বা 'পাবলিক' না থেকে প্রকৃত অর্থেই 'সামষ্টিক' বা 'কমিউনিটি'র সম্পদে পরিণত হয়। সামাজিক অংশগ্রহণের ফলে স্থানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং ব্যবহারকারীদের কাছে তা আপন ও সুরক্ষিত বলে বিবেচিত হয়।

খেলাধুলা শরীরকে শক্তিশালী করে, সংস্কৃতি আত্মাকে সমৃদ্ধ করে এবং উভয়ই সম্প্রদায়কে সুদৃঢ় করে। একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ কেবল বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা দেয় না, বরং পূর্ণাঙ্গ জীবনযাপনের সুযোগও করে দেয়। খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় কমায়, জীবনযাত্রার মান বা সুস্থতার সূচক উন্নত করে এবং তরুণদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সহাবস্থানের মনোভাব গড়ে তোলে। সহজলভ্য বিনোদন সাংস্কৃতিক পরিসরকে প্রসারিত করে, সৃজনশীলতাকে উদ্দীপ্ত করে এবং সামাজিক বঞ্চনা বা বিচ্ছিন্নতা হ্রাস করে। যখন এই স্থানগুলো শহরের বিভিন্ন এলাকায় সুষমভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তখন শহরটি আরও প্রাণবন্ত, নিরাপদ ও সমন্বিত হয়ে ওঠে এবং সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত পরিচয় আরও শক্তিশালী হয়। যে সমাজ খেলাধুলা ও বিনোদনের সুযোগকে সবার জন্য উন্মুক্ত বা গণতান্ত্রিক করে তোলে, তা কেবল অবসরই দেয় না; বরং মর্যাদা, আপনত্বের বোধ এবং মানবিক বিকাশের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। এই অভিজ্ঞতাগুলোকে সর্বজনীন করে তোলা কোনো বিলাসিতা নয়, বরং একটি ন্যায়ভিত্তিক ও প্রাণবন্ত ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য শর্ত।

৩১. বৃহত্তর কল্যাণের লক্ষ্যে বিপণন

এমন একটি সমাজ কেমন হতো যেখানে গণযোগাযোগ ব্যবস্থা অতিরিক্ত ভোগবিলাসকে উৎসাহিত না করে বরং এমন সব সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করত যা সমষ্টিগত জীবনযাত্রার মান উন্নত করে? মানব ভবিষ্যতের রূপায়ণে এটি একটি অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কারণ একটি সমাজ তার প্রকাশ্য প্রচার ও যোগাযোগের মাধ্যমে যা কিছুকে প্রাধান্য দেয়, তা-ই মানুষের আকাঙ্ক্ষা, অভ্যাস ও অগ্রাধিকারগুলোকে গড়ে তোলে। যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি ব্যাপক পরিসরে মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে, তবে একে সামাজিক সুস্থতা, পরিবেশগত ভারসাম্য এবং সম্প্রদায়ের সংহতি বৃদ্ধির হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা সম্ভব।

বর্তমান সময়ে অর্থনীতি ও দৈনন্দিন জীবনে বিপণন বা মার্কেটিং এক কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। এটি ভোগের প্রবণতা, জীবনধারা, সামাজিক আকাঙ্ক্ষা এবং এমনকি মানুষের আত্মপরিচয়ের ধরণও নির্ধারণ করে দেয়। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের ওপর এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর; কারণ প্রতিনিয়ত বিজ্ঞাপনের বার্তা তাদের কাছে সাফল্য, সুখ এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ধারণাগুলোকে নতুন করে গড়ে তোলে। যোগাযোগের এই শক্তিটি একদিকে যেমন অত্যধিক ভোগের চক্রকে আরও জোরদার করতে পারে, তেমনি অন্যদিকে স্বাস্থ্যকর, টেকসই এবং সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল জীবনযাত্রাকেও উৎসাহিত করতে পারে।

বর্তমান বিপণন মডেলের মূল সমস্যা হলো এমন সব উদ্দীপকের আধিপত্য, যা মানুষকে ক্রমাগত নতুন কিছু অর্জন এবং তাৎক্ষণিক তৃপ্তি লাভের দিকে ধাবিত করে। এর কারণ নিহিত রয়েছে সেই সব যোগাযোগ কৌশলের মধ্যে, যা ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে ভোগবিলাস, বাহ্যিক রূপ, সামাজিক মর্যাদা এবং বস্তুগত সম্পদের সাথে যুক্ত করে। সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার পরিবর্তে এই ব্যবস্থা কৃত্রিম আকাঙ্ক্ষাকে বাড়িয়ে তোলে এবং এমন ধারণা প্রচার করে যে—সুখ, স্বীকৃতি ও সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা—সবকিছুই নির্ভর করে ক্রমাগত কেনাকাটার ওপর। এর ফলে সামাজিক উদ্বেগ, ঋণগ্রস্ততা ও অপচয় বৃদ্ধি পায় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। পরিশেষে এমন এক সংস্কৃতির জন্ম হয় যেখানে মানুষের আকাঙ্ক্ষা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে, অথচ প্রকৃত তৃপ্তি ক্রমশ অধরা হয়ে পড়ে। এই মডেলে বিপণন ব্যবস্থা বৃহত্তর কল্যাণের পথ দেখানোর পরিবর্তে কৃত্রিম চাহিদার সৃষ্টি করে। আমরা দেখতে পাই—পরিবারগুলো অবাস্তব মানদণ্ডের চাপে পিষ্ট হচ্ছে; তরুণরা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তুলে ধরা ভাবমূর্তির সাথে নিজেদের আত্মসম্মানবোধকে জড়িয়ে ফেলছে; ব্যক্তিমানুষ এক ধরণের 'ক্ষতিপূরণমূলক ভোগের' (compensatory consumption) চক্রে আটকা পড়ছে; এবং বিভিন্ন সম্প্রদায় সহজ ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন পদ্ধতি থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। বিষয়টি কেবল

অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং এটি মানসিক স্বাস্থ্য, আবেগীয় ভারসাম্য এবং মানবিক সম্পর্কের গুণগত মানের সাথেও গভীরভাবে জড়িত।

তবে এখানেই এক গভীর সম্ভাবনারও উন্মেষ ঘটে: যোগাযোগ ব্যবস্থা আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করার হাতিয়ার হওয়া থেকে বেরিয়ে এসে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিতে পরিণত হতে পারে। এখানে 'বৃহত্তর কল্যাণমুখী বিপণন ব্যবস্থা' (Common Good Marketing System)-এর কথা বলা হচ্ছে, যা স্বাস্থ্য, সহাবস্থান, শিক্ষা, টেকসই জীবনযাপন এবং আবেগীয় ভারসাম্যকে উৎসাহিতকারী সরকারি, সামাজিক ও বেসরকারি প্রচারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। এর প্রথম ধাপ বা মূল ভিত্তি হলো স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার প্রসার। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো—এমন সব যোগাযোগ বা প্রচারণাকে উৎসাহিত করা যা সচেতন খাদ্যাভ্যাস, শারীরিক কার্যকলাপ, পর্যাপ্ত ঘুম, মানসিক সুস্থতা এবং রোগ প্রতিরোধের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়। এরপর প্রয়োজন মানবিক বন্ধনগুলোকে সুদৃঢ় করা। বিভিন্ন প্রচারভিযান ও বিষয়বস্তুর মাধ্যমে পারিবারিক সহাবস্থান, বন্ধুত্ব, সাম্প্রদায়িক সংহতি, প্রজন্মের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের বিষয়গুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। তৃতীয় দিকটি হলো দায়িত্বশীল ভোগের জন্য শিক্ষা। ক্রমাগত পণ্য পরিবর্তনের প্রবণতাকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে, প্রচারণায় পণ্যের স্থায়িত্ব, মেরামত ও পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা, টেকসই পছন্দ এবং পরিবেশগত সচেতনতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। চতুর্থ দিকটি হলো প্রকৃতি ও মানবিক সময়ের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন। সবুজ পরিবেশের সান্নিধ্যে জীবনযাপন, টেকসই যাতায়াত ব্যবস্থা, সমষ্টিগত অবসর এবং জীবনের অত্যধিক ও বাধ্যতামূলক গতি কমিয়ে আনা—এসবকেই সাফল্য ও সুস্থতার যথার্থ রূপ হিসেবে তুলে ধরতে হবে।

পরবর্তী পদক্ষেপ হলো সরকারি ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৈতিক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা, যাতে ভয়, হীনম্মন্যতা বা ভোগবাদী তাড়নাকে পুঁজি করে চালানো বিভ্রান্তিকর বা কারসাজিমূলক কার্যক্রম সীমিত করা যায়। এরপর সামাজিক কল্যাণে সহায়ক প্রচারভিযানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং যেসব কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান জনকল্যাণমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তাদের জন্য সরকারি সনদ বা স্বীকৃতির ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয় পদক্ষেপটি হলো এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে গণমাধ্যম সাক্ষরতার (media literacy) অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে নাগরিকরা ভোক্তা-কেন্দ্রিক বার্তাগুলোকে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়ে ওঠেন।

বর্তমান ব্যবস্থাটি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এর বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাত মূলত অসীম আকাঙ্ক্ষা, কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট অভাব এবং দ্রুততর ভোগ-প্রক্রিয়ার ওপর গভীরভাবে নির্ভরশীল। এখানে নৈতিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করা হয়, বাণিজ্যিক স্বাধীনতার অবাধ ওকালতি করা হয় এবং এমন সব ধারণা প্রচার করা হয় যা ভোগকে কৃত্রিমভাবে উসকে দেওয়াকে অর্থনৈতিক অগ্রগতির সমার্থক হিসেবে তুলে ধরে। বিপণন বা মার্কেটিং কেবল পণ্য সম্পর্কে তথ্য দেয় না, বরং এটি মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষা তৈরির এক কৌশল হিসেবে কাজ করে। এই ব্যবস্থাটি নিরাপত্তাহীনতা, সামাজিক তুলনা এবং হীনম্মন্যতাকে ভোগের স্থায়ী চালিকাশক্তিতে রূপান্তর করতে শেখে। এই প্রতিরোধ কেবল করপোরেট বা ব্যবসায়িক স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা সাংস্কৃতিক স্তরেও বিদ্যমান; এটি এমন সব অভ্যাস, প্রতীক ও প্রত্যাশার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে যা দৈনন্দিন জীবনে প্রচারিত বার্তার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত শক্তিশালী হতে থাকে।

নৈতিক নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক চাপ, সমালোচনামূলক শিক্ষা এবং মানবীয় ও পরিবেশগত দায়বদ্ধতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্র্যান্ড ও প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি জনস্বীকৃতির মাধ্যমে এই প্রতিরোধকে জয় করতে হবে। প্রথম পদক্ষেপটি হলো আক্রমণাত্মক বিজ্ঞাপন, আবেগীয় কারসাজি এবং বিশেষ করে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মতো সংবেদনশীল গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে তৈরি উদ্দীপক প্রচারণার বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা বা মানদণ্ড নির্ধারণ করা। যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা তার সামাজিক প্রভাবের জন্য জবাবদিহি করতে শুরু করে, তখন মনস্তাত্ত্বিক শোষণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মডেলগুলোর সুযোগ সংকুচিত হয়ে আসে। এরপর প্রতীকী বা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার সরকারি স্বীকৃতি, স্বাস্থ্য-টেকসই জীবনযাপন ও সহাবস্থানমূলক প্রচারণার জন্য প্রণোদনা, বিদ্যালয়ে গণমাধ্যম-সচেতনতা (media literacy) শিক্ষা এবং ভালো কাজের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পুরস্কারের মতো ছোট ছোট পদক্ষেপগুলো কৃত্রিম আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে যৌথ কল্যাণের দিকে সমাজকে ধাবিত করার চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

ঠিক এখানেই আশা একটি সম্মিলিত কণ্ঠস্বর খুঁজে পায়। বিপণন তখন কেবল পণ্য বিক্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে স্বাস্থ্যকর, ভারসাম্যপূর্ণ ও মানবিক জীবনযাত্রার প্রচারে মনোনিবেশ করে। যখন কোনো বার্তা অভাববোধকে উসকে না দিয়ে বরং পরিপূর্ণতার বোধ জাগিয়ে তোলে, তখন সমাজ এক নতুন ও স্বস্তিদায়ক শ্বাস নিতে শুরু করে। ভবিষ্যৎ

কেবল আইন বা কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে না, বরং আমরা প্রতিদিন যেসব ধারণা বা আখ্যান (narratives) চর্চা করি, তার ওপরও তা নির্ভর করবে। যোগাযোগের প্ররোচনামূলক শক্তিকে সঠিক পথে চালিত করার মাধ্যমে অতিরিক্ত ভোগের সংস্কৃতি হ্রাস পায়, সমষ্টিগত মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে এবং পরিবেশগত সচেতনতা জোরদার হয়। তরুণরা আরও গঠনমূলক আদর্শ বা উদাহরণ পেতে শুরু করে, জনগোষ্ঠী বা কমিউনিটিগুলো আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং দৈনন্দিন সিদ্ধান্তগুলোতে দীর্ঘমেয়াদী মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটতে থাকে। যে সমাজ ভালো বা ইতিবাচক বিষয়গুলো ছড়িয়ে দিতে শেখে, সেই সমাজেই ভালো বা কল্যাণকর জীবনযাপনের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে ওঠে।

৩২. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মানুষের অভিপ্রায়

প্রযুক্তি যখন কেবল নির্দেশ নয়, বরং মানুষের পছন্দের পেছনের অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যও বুঝতে শুরু করে, তখন কী ঘটে? এই প্রশ্নটি ভবিষ্যতের বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার খোরাক জোগায়: বিষয়টি কেবল অধিকতর দক্ষ যন্ত্রের নয়, বরং এমন সব ব্যবস্থার যা আচরণগত ধরন, সমষ্টিগত প্রয়োজন এবং সামাজিক লক্ষ্যগুলোকে অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। মূল প্রশ্নটি প্রযুক্তিগত অগ্রগতির বিষয় নয়, বরং এই অগ্রগতি কাদের জন্য এবং কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে—তা-ই মুখ্য।

বর্তমানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, পরিবহন, অর্থব্যবস্থা এবং জনপ্রশাসনের মতো ক্ষেত্রগুলোতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের দৈনন্দিন সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে। অ্যালগরিদমগুলো শহরের জনস্রোত বা যান চলাচল বিন্যাস, স্বাস্থ্যঝুঁকি শনাক্তকরণ, ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ দক্ষতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করছে। মানুষের পছন্দ অনুমান করা, আচরণ সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া এবং ব্যাপক পরিসরে মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করার ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তির সক্ষমতা ক্রমশ বাড়ছে; ফলে এটি সরাসরি সমাজের কাঠামোগত বিন্যাসকে প্রভাবিত করছে।

বর্তমান মডেলটির সমস্যা নিহিত রয়েছে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা এবং নৈতিক দায়বদ্ধতার মধ্যকার ব্যবধানে। এর কারণ হলো এমন সব ব্যবস্থার ব্যবহার যা দক্ষতা,

মুনাফা বা নিয়ন্ত্রণের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়, অথচ সেগুলোর মানদণ্ড, উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে পর্যাপ্ত স্বচ্ছতা থাকে না। সমষ্টিগত স্বার্থের স্পষ্ট সেবার পরিবর্তে, প্রযুক্তিকে এমনভাবে নকশা করা হচ্ছে যাতে ব্যবহারকারীর সম্পৃক্ততা বা 'রিটেনশন' (retention) সর্বোচ্চ করা যায়, ভোক্তার আচরণের পূর্বাভাস পাওয়া যায়, সংবেদনশীল সিদ্ধান্তগুলো স্বয়ংক্রিয় করা যায় এবং তথ্যকে গুটিকয়েক ক্ষমতার কেন্দ্রে কুক্ষিগত করা যায়। এর ফলে পক্ষপাত বা বৈষম্য জোরদার হচ্ছে, মানুষের পছন্দকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, অত্যধিক নজরদারি চালানো হচ্ছে এবং তথ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হচ্ছে। এর চূড়ান্ত পরিণতি হলো মানুষের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন হারানো এবং এমন সব স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্তের ঝুঁকি তৈরি হওয়া যা মানুষের মর্যাদা, বৈচিত্র্য ও সামাজিক কল্যাণের প্রতিফলন ঘটায় না। মানুষের ন্যায়সংগত অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সমষ্টিগত জীবনের চেয়ে ক্ষমতার কাঠামোকেই বেশি সেবা দিতে পারে। ঝুঁকিটি প্রযুক্তিতে নয়, বরং প্রযুক্তিকে চালিত করার উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত। অস্বচ্ছ ব্যবস্থাগুলো ঐতিহাসিক কুসংস্কারের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে, বঞ্চনা বা বিচ্ছিন্নতাকে আরও গভীর করতে পারে এবং মানুষকে কেবল পরিসংখ্যানগত তথ্যে পরিণত করতে পারে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের হাতিয়ার হওয়া থেকে সরে এসে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রসার, সংকট প্রতিরোধ এবং মানুষের সামগ্রিক বিকাশে সহায়ক শক্তিতে পরিণত হতে হবে। মানবিক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গড়ে তোলার পক্ষে মত দেওয়া হচ্ছে, যা স্বচ্ছতা, নিরীক্ষাযোগ্যতা, ব্যাখ্যাযোগ্যতা এবং সামাজিক সামঞ্জস্যের নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে গঠিত হবে। এর প্রথম ধাপ হলো অ্যালগরিদম-সংক্রান্ত স্বচ্ছতা; অর্থাৎ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যাতায়াত ব্যবস্থা, সম্পদ বণ্টন এবং নগর পরিকল্পনার মতো যেসব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সামাজিক প্রভাব রয়েছে, সেখানে ব্যবহৃত ব্যবস্থাগুলোকে এমন মানদণ্ডের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে যা জনসমক্ষে প্রকাশযোগ্য এবং কারিগরি নিরীক্ষার আওতাভুক্ত। দ্বিতীয় ধাপটি হলো বহু-অংশীজনের অংশগ্রহণে মানবিক তদারকি। মানুষের জীবনকে সরাসরি প্রভাবিত করে এমন কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কোনো স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করতে দেওয়া উচিত নয়। বিশেষজ্ঞ, সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, আইন বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ এবং সাধারণ নাগরিকদের সমন্বয়ে গঠিত বহু-বিভাগীয় পরিষদের মাধ্যমে এই প্রযুক্তিগুলোর ব্যবহারের ওপর নিরন্তর নজরদারি চালানো উচিত। তৃতীয় ধাপটি হলো

সমাজের প্রকৃত চাহিদার সাথে এগুলোর সামঞ্জস্য বিধান করা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, বুদ্ধিদীপ্ত নগর পরিকল্পনা, ব্যক্তিগত চাহিদা-মাফিক শিক্ষা, সামাজিক সংকট আগাম শনাক্তকরণ, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং লজিস্টিক বা স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মতো পরিস্থিতি রোধে সহায়তা করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রযুক্তি কেবল তাৎক্ষণিক সাড়া দেওয়ার গণ্ডি পেরিয়ে ভবিষ্যতের যৌথ প্রকল্পগুলোতে সহযোগিতার ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। প্রথমত, অ্যালগরিদম-ভিত্তিক শাসনব্যবস্থার জন্য আমাদের এমন সব সরকারি কাঠামো তৈরি করতে হবে, যেখানে ব্যাপক প্রভাব বিস্তারকারী সিস্টেমগুলোর ক্ষেত্রে আবশ্যিক নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলা বাধ্যতামূলক হবে। এরপর আসে সামাজিক কল্যাণের ওপর নিবদ্ধ সরকারি ও সমবায়-ভিত্তিক এআই (AI) প্ল্যাটফর্মের উন্নয়ন। আর তৃতীয় ধাপে রয়েছে এই প্রযুক্তিগুলোর সমালোচনামূলক ও সচেতন ব্যবহারের জন্য নাগরিক ও পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

এটা স্পষ্ট যে বর্তমান ব্যবস্থাটি পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। প্রযুক্তিগত ক্ষমতার বিশাল কেন্দ্র, রুদ্ধদ্বার করপোরেট কাঠামো এবং অ্যালগরিদমের অস্বচ্ছতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মডেলগুলো—মানদণ্ড উন্মুক্ত করা, তথ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ সীমিত করা এবং ডিজিটাল সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা পুনর্বণ্টনের বিষয়গুলোকে বাধাগ্রস্ত করে। এই প্রতিরোধ বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়: মডেল সংক্রান্ত গোপনীয়তা, কম্পিউটেশনাল অবকাঠামোর কেন্দ্রীকরণ, নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়া (regulatory capture) এবং এমন সব বয়ান বা প্রচারণার মাধ্যমে যা প্রযুক্তিকে একটি নিরপেক্ষ ও স্বায়ত্তশাসিত ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরে—যেখানে গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের কোনো প্রবেশাধিকার নেই। অস্বচ্ছতা কেবল একটি কারিগরি বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এটি ক্ষমতার একটি কৌশল। সুপারিশ, ফিল্টারিং, অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং ডেটা বিশ্লেষণের মানদণ্ড যারা নিয়ন্ত্রণ করে, তারাই মানুষের আচরণ, সুযোগ-সুবিধা, তথ্যের প্রাপ্যতা এবং শেষ পর্যন্ত সমষ্টিগত সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে। তাই এই ব্যবস্থার প্রতিরোধ কেবল অর্থনৈতিক স্তরেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা জ্ঞানের কাঠামোর জগতেও বিদ্যমান।

গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণবিধি, উন্মুক্ত বিজ্ঞান (open science), সর্বজনীন ডিজিটাল অবকাঠামো এবং নিরন্তর সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই প্রতিরোধকে জয় করতে হবে। প্রথমত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য, কর্মসংস্থান, ঋণ এবং জন-ব্যবস্থাপনার মতো যেসব ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সামাজিক প্রভাব ব্যাপক, সেখানে অ্যালগরিদমিক মানদণ্ডের বিষয়ে

প্রগতিশীল স্বচ্ছতার দাবি তুলতে হবে। যখন সমাজের অধিকাংশ মানুষ বুঝতে পারবে কীভাবে স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্তগুলো নেওয়া হয়, তখন সমষ্টিগত তদারকির একটি বৈধ ভিত্তি তৈরি হবে। এরপর, আমাদের এমন একটি সর্বজনীন ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে যাতে স্বাধীন নিরীক্ষা বা অডিট ব্যবস্থা থাকবে। মানদণ্ড প্রকাশ, বাহ্যিক পক্ষপাতিত্ব যাচাই, স্থায়ী নৈতিকতা বিষয়ক পরিষদ, সর্বজনীন ডেটা ব্যবস্থা এবং স্বচ্ছ জবাবদিহিতার নিয়মাবলির মতো ছোট ছোট পদক্ষেপগুলো প্রযুক্তিগত ক্ষমতার ওপর ব্যক্তিগত বা করপোরেট নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে আনে।

কারিগরি দক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ একে অপরের পরিপন্থী নয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের ইচ্ছাশক্তি বা উদ্দেশ্যকে প্রতিস্থাপন করবে না, বরং তাকে আরও শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করবে। সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক ভবিষ্যৎ সেটিই নয় যেখানে যন্ত্র আমাদের হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়; বরং সেটিই শ্রেয়, যেখানে যন্ত্র আমাদের আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে—যেখানে অধিকতর তথ্য, ন্যায়বিচার এবং সমষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন থাকে। বৈধ মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত প্রযুক্তি আরও ন্যায়পরায়ণ শহর, অধিকতর দক্ষ ব্যবস্থা এবং মর্যাদাপূর্ণ জীবন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহযোগী হয়ে উঠতে পারে। স্বচ্ছতা ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার ফলে জন-আস্থা সুদৃঢ় হয় এবং মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বায়ত্তশাসন অক্ষুণ্ণ থাকে। প্রকৃত অগ্রগতি কেবল আরও শক্তিশালী যন্ত্র তৈরির মধ্যেই নিহিত নয়, বরং সেই যন্ত্রকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্য আরও প্রজ্ঞাবান সমাজ গড়ে তোলার মধ্যেই নিহিত।

৩৩. নতুন ইন্টারনেট — যেখানে সংযোগ ঘটে

তথ্য, যোগাযোগ এবং মানব সংগঠনের মূল স্থান যদি বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিগত স্বার্থ পরিবেশন করার জন্য কাঠামোগতভাবে চলতে থাকে তাহলে আমরা কীভাবে সত্যিকারের ন্যায়সঙ্গত সমাজ গড়ে তুলতে পারি? ইন্টারনেট শুধুমাত্র একটি হাতিয়ার নয়: এটি এমন একটি অঞ্চল যেখানে সিদ্ধান্তগুলি প্রভাবিত হয়, আচরণগুলিকে আকার দেওয়া হয় এবং বাস্তবতাগুলি তৈরি করা হয়। তাই মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করার জন্য সেই ডিজিটাল পরিবেশের গভীরভাবে পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন যেখানে সেই ভবিষ্যত বাস করা হবে।

আজ, প্রধান ইন্টারনেট মডেল ডেটা নিষ্কাশন এবং নগদীকরণের উপর ভিত্তি করে। কোটি কোটি মানুষের কার্যকলাপ, তাদের অনুসন্ধান, মিথস্ক্রিয়া, পছন্দ এবং রুটিনগুলি কয়েকটি কাঠামোর হাতে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক মূল্যে রূপান্তরিত হয়। প্রভাবটি গভীর: সর্বাধিক মনোযোগ ধরে রাখার জন্য ডিজাইন করা প্ল্যাটফর্ম, অ্যালগরিদমগুলিকে সম্প্রসারিত করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, এবং এমন সিস্টেমগুলি যা ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক সুস্থতার জন্য তাত্ক্ষণিক উদ্দীপনাকে অগ্রাধিকার দেয়। ইন্টারনেট একটি নিরপেক্ষ মাধ্যম নয় এবং এটি সমসাময়িক জীবনের অন্যতম প্রধান সংগঠক শক্তি হয়ে উঠেছে।

বর্তমান মডেলের সমস্যা হল এমন একটি স্থানের ব্যক্তিগত বরাদ্দ যা বাস্তবে মানবতার জন্য একটি অপরিহার্য অবকাঠামো হয়ে উঠেছে। এর কারণ হল প্রযুক্তিগত ঘনত্ব, তথ্যের উপর ভিত্তি করে লাভের যুক্তি এবং কার্যকর জনশাসনের অনুপস্থিতি। ফলস্বরূপ, আমরা যা দেখি তা হল ধ্রুবক নজরদারি, আচরণের হেরফের, চরম বিষয়বস্তুর বিস্তার, এবং ব্যবহারের ধরণগুলি অন্তর্ভুক্ত করা যা নির্ভরতা এবং সামাজিক বিভক্তির পক্ষে। সবশেষে, প্রভাব হল স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসনের ক্ষতি, জনসাধারণের বিতর্কের বিকৃতি এবং সম্মিলিত বিশ্বাসের দুর্বলতা। ইন্টারনেট সংযোগ করে, কিন্তু ছড়িয়ে দেয়। এটা জানিয়ে দেয়, কিন্তু বিভ্রান্তও করে। এটি কাছাকাছি নিয়ে আসে, তবে বিচ্ছিন্নও করে।

ইন্টারনেট মনোযোগ আকর্ষণের জায়গা হওয়া বন্ধ করে দিতে পারে এবং সহযোগিতা, স্বচ্ছতা এবং সাধারণ ভালোর দিকে ভিত্তিক মানব সংগঠনের একটি বিশ্বব্যাপী ব্যবস্থা হয়ে উঠতে পারে। একটি সামাজিক উদ্দেশ্য সহ একটি পাবলিক ইন্টারনেট নির্মাণের পক্ষে সমর্থন করা হয়, মানবতার একটি সাধারণ অবকাঠামো হিসাবে সংগঠিত, যার কেন্দ্রীয় মূল্য লাভ নয়, তবে সমাজে জীবন। প্রথম ধারণা হল জনস্বার্থের বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা। ডিজিটাল সিস্টেমগুলিকে অবশ্যই পাবলিক ম্যানেজমেন্ট, রিসোর্স অ্যালোকেশন, সোশ্যাল ইন্ডিকেটর, প্রোডাকশন, প্ল্যানিং এবং পলিসি এক্সিকিউশন সংক্রান্ত তথ্যের স্পষ্ট, রিয়েল-টাইম এবং নিরীক্ষাযোগ্য অ্যাক্সেসের অনুমতি দিতে হবে। তথ্য অস্বচ্ছ হওয়া বন্ধ করে এবং সচেতন অংশগ্রহণের একটি উপকরণ হয়ে ওঠে। তারপর, আমাদের যোগাযোগের ইঞ্জিন হিসাবে পৃথক প্রচার এবং বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের যুক্তিকে দূর করতে হবে। এর মানে টার্গেট করা বিজ্ঞাপন, প্রতিযোগিতামূলক স্ব-প্রচার এবং দৃশ্যমানতার নগদীকরণের উপর ভিত্তি করে সিস্টেমের

সমাপ্তি। তারপর, ডিজিটাল স্থান মনোযোগের সংগ্রামের জন্য একটি ক্ষেত্র হবে না এবং জ্ঞান বিনিময়, যৌথ সংগঠন এবং সামাজিক নির্মাণের পরিবেশে পরিণত হবে।

তৃতীয় ধারণাটি হল আন্তঃসংযুক্ত স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একীকরণ, অভিজ্ঞতা, সমাধান, শিক্ষা এবং অগ্রগতি ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি জীবন্ত নেটওয়ার্ক গঠন করা। একটি অঞ্চলে যা বিকশিত হয় তা অন্যদের দ্বারা বোঝা, অভিযোজিত এবং উন্নত করা যায়, যা যৌথ বিবর্তনের একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ তৈরি করে। তারপরে, আমাদের অবশ্যই এই প্রযুক্তিটিকে সত্যিকারের মানুষের চাহিদার সাথে সারিবদ্ধ করতে হবে। প্ল্যাটফর্মগুলিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, সম্প্রদায় সংগঠন এবং সামাজিক অংশগ্রহণের সুবিধার্থে ডিজাইন করা দরকার, বিচ্ছুরিত উদ্দীপনাগুলিকে সমষ্টিগত মূল্য তৈরির দিকে ভিত্তিক কার্যকারিতার সাথে প্রতিস্থাপন করা উচিত।

প্রথম বাস্তবায়ন পর্যায়গুলি হল বহুবচন শাসনের অধীনে স্বচ্ছ, আন্তঃপরিচালনযোগ্য এবং নিরীক্ষণযোগ্য প্রোটোকলের উপর ভিত্তি করে একটি পাবলিক এবং উন্মুক্ত ডিজিটাল পরিকাঠামোর উন্নয়ন। তারপরে, আমাদের অবশ্যই এই নতুন পরিবেশে প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলিকে ধীরে ধীরে স্থানান্তর করতে হবে, যার মধ্যে রয়েছে পাবলিক ইনফরমেশন সিস্টেম, ডিজিটাল শিক্ষা, নাগরিকদের অংশগ্রহণ এবং আন্তঃসাম্প্রদায়িক সমন্বয়। তৃতীয় পর্যায় হল ইন্টারনেটের সচেতন ব্যবহারের জন্য সামাজিক প্রশিক্ষণ, সহযোগিতা, সত্যবাদিতা এবং কল্যাণের দিকে ভিত্তিক ডিজিটাল সংস্কৃতির প্রচার। স্বচ্ছতা প্রাতিষ্ঠানিক আস্থাকে শক্তিশালী করে এবং মনোযোগের জন্য প্রতিযোগিতা দূর করা উদ্বেগ ও হেরফের কমায়। সম্প্রদায়গুলির মধ্যে একীকরণ সমাধানগুলিকে ত্বরান্বিত করে, এবং সাধারণ ভালোর উপর ফোকাস ইন্টারনেটকে মানব উন্নয়নের একটি উপকরণে রূপান্তরিত করে।

ডেটা থেকে অর্থ উপার্জন, বিজ্ঞাপন এবং তথ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ—এসবের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বিশাল অর্থনৈতিক কাঠামো এমন যেকোনো মডেলের বিরোধিতা করবে যা তাদের প্রভাব ও সম্পদের কেন্দ্রীভূত অবস্থানকে কমিয়ে দেয়। সমন্বিত আন্তর্জাতিক নীতিমালা প্রণয়ন, শক্তিশালী ও জনবান্ধব বিকল্প ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বর্তমান মডেলের প্রভাব সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই প্রতিরোধের মোকাবিলা করতে হবে। এই পরিবর্তন রাতারাতি ঘটবে না; তবে তা অনিবার্য, কারণ সমাজ

ক্রমশ উপলব্ধি করছে যে ডিজিটাল জগৎ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে চলতে পারে না। ইন্টারনেট যখন শোষণের হাতিয়ার না হয়ে সেবার মাধ্যম হয়ে উঠবে, তখন এটি মানবজাতির ইতিহাসে সৃষ্ট অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐক্যবদ্ধকারী শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারবে। ভবিষ্যৎ কেবল পারস্পরিক সংযোগের ওপরই গড়ে উঠবে না, বরং তা হবে সচেতনতা-নির্ভর।

৩৪. সমাজ যখন পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়

বর্তমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা কাঠামোই যখন সেই ব্যবস্থা থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়, তখন কীভাবে একটি যৌথ উদ্যোগকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব? এই প্রশ্নটি কেবল তাত্ত্বিক নয়: এটি বোঝাপড়া ও পরিবর্তনের মধ্যবর্তী সন্ধিক্ষণকে চিহ্নিত করে। যেকোনো কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য কেবল নতুন ধারণাই যথেষ্ট নয়, বরং শক্তির ভারসাম্য পুনর্নির্ধারণে সক্ষম সুসংহত পদক্ষেপেরও প্রয়োজন।

এই পুরো প্রক্রিয়াটিতে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, অর্থনৈতিক, তথ্যগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন কেবল দক্ষতার জোরে টিকে থাকে না; বরং এর পেছনে কাজ করে কাঠামোগত জড়তা, দৈনন্দিন নির্ভরতা এবং সামাজিক বিভাজন। অধিকাংশ মানুষ প্রায়শই নিজের অজান্তে এমন সব ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে যা আসলে তাদেরই সীমাবদ্ধ করে ফেলে। এই চক্র ভাঙার জন্য সহিংসতার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন ব্যাপক পরিসরে সুসংগঠিত সচেতনতা। এই পর্যায়ের লক্ষ্য কোনো কিছু ধ্বংস করা নয়, বরং ক্ষমতার প্রবাহকে ভিন্ন পথে চালিত করা। এর উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনকারী কাঠামোগুলোর প্রভাব কমিয়ে আনা এবং একই সাথে জনকল্যাণমুখী বিকল্প ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। সুতরাং, এই রূপান্তরটি ঘটে সুসংহত, প্রতীকী এবং অর্থনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপের মাধ্যমে। এখানেই লক্ষ লক্ষ মানুষের সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ কার্যক্রম ক্ষমতার ও সম্পদের কাঠামোর ওপর পরিমাপযোগ্য ও দৃশ্যমান প্রভাব সৃষ্টি করে।

প্রথম পদক্ষেপটি হলো ডেটা বা তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা। কৌশলগতভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার একটি বৈশ্বিক দিনের প্রস্তাব করা হচ্ছে: ২৪ ঘণ্টার জন্য মোবাইল ডিভাইসগুলো অফলাইনে থাকবে—মোবাইল ডেটা বা

সক্রিয় জিওলোকেশন (অবস্থান শনাক্তকরণ) ছাড়া এবং ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্কের ন্যূনতম ব্যবহারসহ (কেবল প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন সংযোগের ক্ষেত্রে)। এর লক্ষ্য বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং নির্ভরতার বিপরীত চিত্রটি বাস্তবে তুলে ধরা: ডেটার প্রবাহ যখন ধীর হয়ে যায়, তখন বোঝা যায় যে পুরো ব্যবস্থাটি আসলে মানুষের সম্মিলিত কার্যক্রমের ওপর কতটা নির্ভরশীল। ব্যাপক পরিসরে করা এই সাধারণ কাজটি এমন বিষয়কে দৃশ্যমান করে তোলে যা সাধারণত অদৃশ্য থাকে: প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষের সৃষ্ট সেই মূল্য বা অবদান।

দ্বিতীয় পদক্ষেপটি হলো সম্পদ কেন্দ্রীভবনের নেটওয়ার্কগুলোকে উন্মোচন করা। এমন একটি দিন নির্ধারণ করা যখন ব্যাপক পরিসরে স্পষ্ট ও সহজবোধ্য শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু তৈরি ও প্রচার করা হবে, যা বিমূর্ত সংখ্যাগুলোকে বাস্তব পরিস্থিতির আলোকে ব্যাখ্যা করবে। আবাসন, খাদ্য, অবকাঠামো বা স্বাস্থ্যসেবার নিরিখে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের প্রকৃত মূল্য কত? সম্পদের সামান্য পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে কত মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলা সম্ভব? এর লক্ষ্য কেবল অন্তঃসারশূন্য ক্ষোভ সৃষ্টি করা নয়, বরং সম্মিলিত স্বচ্ছতা ও বোঝাপড়া তৈরি করা। অসমতার ব্যাপকতা যখন মানুষের বোধগম্য হয়ে ওঠে, তখন আর উদাসীন থাকা সম্ভব হয় না।

তৃতীয় পদক্ষেপটি হলো জলবায়ু সংকটকে সামনে নিয়ে আসার দিন—এটি এমন একটি সুসংহত আয়োজন যার মাধ্যমে ব্যবস্থার গতি কমিয়ে আনা হবে এবং দৃশ্যমান জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। পরিবেশগত বিপর্যয়ের ফলাফল কেবল প্রচার করার পরিবর্তে, এই কর্মসূচিতে এমন সব কর্মকাণ্ডের সমন্বিত ও সাময়িক স্থগিতাদেশের প্রস্তাব করা হয়েছে যা অত্যধিক কার্বন নিঃসরণ ও অপ্রয়োজনীয় ভোগের সাথে সরাসরি জড়িত; যেমন—ব্যক্তিগত মোটরচালিত যানবাহনের ব্যবহার ব্যাপক হারে কমিয়ে আনা, অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা স্বেচ্ছায় বন্ধ রাখা, অ-অপরিহার্য খাতগুলোর কার্যক্রম প্রতীকীভাবে স্থবির করে দেওয়া এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরিবেশের ওপর কম প্রভাব ফেলে এমন জীবনযাত্রায় সমষ্টিগতভাবে অভ্যস্ত হওয়া। একই সাথে, আগে থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত ব্যাপকভাবে প্রচার করতে হবে, যাতে নিঃসরণকারী প্রধান উৎসসমূহ, সর্বাধিক দূষণকারী উৎপাদন-প্রক্রিয়া এবং বর্তমান ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য দায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কাঠামোকে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। এর লক্ষ্য কেবল সচেতনতা বৃদ্ধি নয়, বরং সমষ্টিগত আচরণের ওপর এই ব্যবস্থার যে নির্ভরতা রয়েছে তা

দৃশ্যমান করা এবং ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও বড় বড় অর্থনৈতিক শক্তির ওপর যে দায়ভার ন্যস্ত রয়েছে, তা অনস্বীকার্যভাবে সবার সামনে তুলে ধরা। যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ একই সময়ে সেই সব প্রক্রিয়ায় নিজেদের অংশগ্রহণ কমিয়ে আনে যা এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে, তখন একটি দৃশ্যমান ও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বা ভাঙন তৈরি হয়; এটি আলোচনার মোড় বিমূর্ত ধারণা থেকে বাস্তব পরিস্থিতির দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের ওপর এমন চাপ সৃষ্টি করে যাতে তারা কেবল কথার বুলি বা বয়ানের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং সামাজিক পুনর্গঠনের এক বাস্তব ও সুনির্দিষ্ট সংকেতের প্রেক্ষিতে সাড়া দিতে বাধ্য হন।

চতুর্থ ধাপটি হলো সচেতনভাবে বিকল্প বেছে নেওয়ার দিন। এই প্রস্তাবের মূল কথা হলো—নির্দিষ্ট সময়ে স্থানীয় নেটওয়ার্ক, সমবায় এবং স্বতন্ত্র উৎপাদকদের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে পণ্য বা সেবা গ্রহণ করা; আর এর আগে ভৌগোলিক এলাকাভিত্তিক এসব বিকল্পের একটি তালিকা বা মানচিত্র তৈরি করে নেওয়া। বিভিন্ন জনগোষ্ঠী স্থানীয় সরবরাহকারীদের সহজলভ্য তালিকা প্রস্তুত করে এবং সরাসরি কেনাকাটার ব্যবস্থা গড়ে তোলে, যার ফলে বড় বড় প্রতিষ্ঠানের হাতে সম্পদ কুক্ষিগতকারী মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব কমে আসে। একই সাথে, সাধারণ কিছু কমিউনিটি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে স্থানান্তরিত সম্পদের পরিমাণ রেকর্ড ও দৃশ্যমান করা হয়, যা অর্থনৈতিক প্রবাহ পরিবর্তনের একটি বাস্তব সূচক হিসেবে কাজ করে। এর প্রভাব কেবল স্থানীয় এলাকাকে শক্তিশালী করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং বড় ও কেন্দ্রীভূত বাণিজ্যিক চেইনগুলোর আয়ও কমিয়ে দেয়—বিশেষ করে যখন এই কার্যক্রমটি বারবার এবং বৃহত্তর পরিসরে পরিচালিত হয়। এখানে মূল যুক্তিটি উল্টে যায়: কেন্দ্রীভূত কাঠামোকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুষ্ট করার পরিবর্তে, ভোগ বা কেনাকাটা হয়ে ওঠে স্থানীয় এলাকাকে শক্তিশালী করার একটি সচেতন সিদ্ধান্ত। যখন এই আন্দোলনটি ব্যাপকতা লাভ করে, তখন এটি কেবল প্রতীকী বিষয় হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং সম্পদের বাস্তব পুনর্বণ্টনের একটি কার্যকর কৌশল হয়ে ওঠে; এটি প্রমাণ করে যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা কোনো স্থির বিষয় নয়, বরং তা সমষ্টিগত প্রবাহের সাথে পরিবর্তিত হয়।

পরিশেষে, এই বইয়ের বিষয়বস্তুকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে একটি সমন্বিত বৈশ্বিক উদ্যোগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যা এই প্রস্তাবনাকে একটি ধারাবাহিক রাজনৈতিক চাপে পরিণত করতে সক্ষম। এই উদ্যোগের আওতায় কৌশলগত

প্রচারণার একটি সমন্বিত চক্র গড়ে তোলা হবে। সেখানে মডেলটির বিভিন্ন কার্যকারিতা—যেমন বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থাপনায় কর পুনর্বণ্টন, সরকারি কাজে ডিজিটাল স্বচ্ছতা, স্থানীয় উৎপাদন নেটওয়ার্ক, জ্ঞানের সর্বজনীন প্রাপ্যতা এবং কমিউনিটি অবকাঠামো—সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট ও অনুকরণযোগ্য বিষয়বস্তুতে রূপান্তর করা হবে এবং সাথে থাকবে প্রয়োগের বাস্তব উদাহরণ। এই বিষয়বস্তুগুলো একই সাথে বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার করতে হবে এবং এর পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের লক্ষ্য করে নাগরিকদের সংগঠিত করতে হবে; যেমন—সমন্বিতভাবে প্রস্তাবনা জমা দেওয়া, গণপরামর্শে অংশ নেওয়া, শুনানিতে উপস্থিতি এবং বিভিন্ন কাউন্সিল ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন করা। এর লক্ষ্য হলো সুসংগঠিত চাহিদার একটি ধারাবাহিক ও ক্রমবর্ধমান প্রবাহ তৈরি করা, যাতে এই ধরনের প্রস্তাবনা উপেক্ষা করা রাজনৈতিকভাবে ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে। একই সাথে, সংগঠিত গোষ্ঠীগুলো প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করবে এবং কারা পরিবর্তনে সহায়তা করছে আর কারা বাধা দিচ্ছে—তা জনসমক্ষে তুলে ধরবে। এটি কেবল তথ্য জানানোর বিষয় নয়, বরং জ্ঞানকে একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী চাপে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া। ঠিক এই পর্যায়েই রূপান্তরটি সুদৃঢ় হয়: যখন সমষ্টিগত চিন্তাধারা সমাজের গভীরে প্রবেশ করে এবং আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্থায়ী স্থান করে নেয়।

এটা প্রত্যাশিত যে, এই কার্যক্রমগুলো বাধার সম্মুখীন হবে। প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী কাঠামোসমূহ বিভিন্ন বয়ান বা অর্থনৈতিক চাপের মাধ্যমে এই সম্মিলিত আন্দোলনকে গুরুত্বহীন, খণ্ডিত বা অবৈধ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে। এই বাধার মোকাবিলা সরাসরি সংঘাতের মাধ্যমে নয়, বরং সমন্বিত ও অবিচল প্রচেষ্টা এবং সামাজিক সচেতনতা বিস্তারের মাধ্যমেই করতে হবে। সমাজের নিরন্তর অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো ব্যবস্থাই টিকে থাকতে পারে না। যখন এই অংশগ্রহণের ধরন নতুন করে বিন্যস্ত হয়, তখন ক্ষমতার ভারসাম্যও পরিবর্তিত হয়। এই পর্যায়ের প্রত্যাশা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে নিহিত নয়, বরং এই কাজগুলোর সচেতন, প্রগতিশীল ও ক্রমবর্ধমান পুনরাবৃত্তির মধ্যেই তা নিহিত। ছোট ছোট পদক্ষেপ যখন ব্যাপক পরিসরে সমন্বিত হয়, তখন সেগুলো কাঠামোগত শক্তিতে পরিণত হয়। এভাবেই রূপান্তরটি ঘটে—হঠাৎ কোনো বড় ভাঙনের মধ্য দিয়ে নয়, বরং ধারাবাহিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায়। যে সমাজ নিজের শক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, সে সমাজ আর অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয় না, বরং নিজেই নেতৃত্ব দিতে শুরু করে। আর ঠিক এই বিন্দুতেই ভবিষ্যৎ কেবল একটি প্রতিশ্রুতির গণ্ডি পেরিয়ে বাস্তব এক নির্মাণে পরিণত হয়।

পাঠকের উদ্দেশ্যে শেষ কথা

এই বইটি যদি আপনার মনে অস্বস্তি জাগিয়ে থাকে, তবে এটি তার প্রাথমিক উদ্দেশ্যটি সফলভাবে পূরণ করেছে: আমাদের এই জগতটি যে কোনো অনিবার্য বা অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়—সেই বোধটি জাগিয়ে তোলা। কোনো প্রকৃত রূপান্তরই প্রথমে বড় কোনো কাঠামোর মধ্যে জন্ম নেয় না। এর জন্ম হয় প্রাত্যহিক জীবনে, এমন সব মানুষের মাঝে যারা অসমতা, বর্জন এবং গুটিকতক মানুষের বিশেষ সুবিধাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে অস্বীকার করে। এর প্রথম পদক্ষেপটি বিশ্বজয়ের নয়, বরং এমন একটি ছোট পরিসর গড়ে তোলার যেখানে পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই ভিন্ন। এভাবেই গড়ে ওঠে প্রথম স্বায়ত্তশাসিত সম্প্রদায়গুলো: ছোট দল, পরিবার, প্রতিবেশী, সহকর্মী বা বিভিন্ন সংগঠনের মানুষ—যারা কেবল চিন্তাধারার ভিত্তিতে নয়, বরং কর্মপদ্ধতি, অঙ্গীকার এবং পারস্পরিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে একত্রিত হয়। 'সর্বজনীন কল্যাণ'-এর ব্যবস্থাকে আইনে পরিণত করার আগেই প্রয়োজন সেটিকে বাস্তবে যাপন করা।

এরপর, পরিবর্তনটিকে কেবল স্থানীয় গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রভাব ফেলার পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। যদি বর্তমান ব্যবস্থাকে অনেক দূরের বা ধরাছোঁয়ার বাইরের মনে হয়, তবে শুরুটা করুন এমন জায়গা থেকে যেখানে ব্যবস্থাটির একটি দৃশ্যমান রূপ বা 'মুখ' রয়েছে: অর্থাৎ পৌরসভা বা স্থানীয় প্রশাসন। সেখানে নাগরিকের কণ্ঠস্বর এখনো শোনা যায়; সেখানে রাজনীতি সরাসরি রাস্তাঘাট, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং পাড়ার বাস্তব জীবনের সংস্পর্শে আসে। কমিউনিটি কাউন্সিল, গণশুনানি, স্থানীয় সংগঠন, সিটি কাউন্সিল এবং অংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া—এসবই হয়ে ওঠে ব্যবস্থায় নৈতিকভাবে প্রবেশের হাতিয়ার। সর্বজনীন কল্যাণের পক্ষে প্রথম আইনগুলো অবশ্যই এই ভিত্তি থেকেই উঠে আসতে হবে: এমন সব আইন যা হবে ছোট পরিসরের, সুনির্দিষ্ট, দৃশ্যমান এবং যা মানুষের প্রকৃত জীবনের মানোন্নয়ন ঘটিয়ে প্রমাণ করবে যে ভিন্ন কোনো মডেল বা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব।

যখন কোনো পরিবর্তন মানুষের বাস্তব জীবনের উন্নতি ঘটায়, তখন তা কেবল একটি ধারণায় সীমাবদ্ধ না থেকে একটি উদাহরণে পরিণত হয়। একটি 'কোষ' বা একক অন্যটিকে অনুপ্রাণিত করে। একটি পাড়া অন্য পাড়াকে উদ্বুদ্ধ করে। একটি শহর অন্য শহরের অভিজ্ঞতা পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে। যা একটি বাড়িতে শুরু হয়েছিল, তা

ছড়িয়ে পড়ে রাস্তায়। রাস্তায় যার জন্ম হয়েছিল তা পৌঁছায় পাড়ায়; পাড়া থেকে শহরে এবং পরিশেষে তা অঞ্চল ও সমগ্র জাতিতে বিস্তৃত হয়। এভাবেই রূপান্তর একটি গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে নয়, বরং উদাহরণের শক্তি ও সেই বাস্তব প্রমাণের মাধ্যমে—যেখানে ন্যায়বিচার, একাত্মবোধ ও মর্যাদা—সবকিছুই সম্মিলিতভাবে গড়ে তোলা সম্ভব। এই পথচলাটি ক্রমবিকাশমান: বাড়ি, রাস্তা, পাড়া, শহর, অঞ্চল এবং দেশ।

এই উদ্যোগটি কোনো মরীচিকা নয়, তাই এর কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। প্রথমত, কিছু পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা সহজ অথবা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন কিছু দেশে তা ইতিমধ্যেই বাস্তবে রূপ নিয়েছে। আবার অন্য কিছু পদক্ষেপ, যা মধ্যমেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য, তা কেবল শক্তিশালী সামাজিক সংহতির মাধ্যমেই সম্ভব হয়ে ওঠে। পরিশেষে, কিছু পরিবর্তনের জন্য গভীর মানসিক স্বীকৃতি ও সাংস্কৃতিক অভিযোজনের প্রয়োজন হয়—এমন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে কয়েক প্রজন্ম লেগে যেতে পারে কিংবা তা হয়তো কখনোই বাস্তবে রূপ নাও নিতে পারে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কীভাবে 'সামষ্টিক কল্যাণ'-কে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তার ব্যবহারিক উদাহরণ তুলে ধরার গুরুত্ব এতে বিন্দুমাত্র কমে যায় না। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো এমন আইন প্রণয়ন করা যা সামষ্টিক কল্যাণ-কেন্দ্রিক অধিকারের নিশ্চয়তা দেয় এবং মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে ক্ষমতা ও সম্পদের কেন্দ্রীভবন হ্রাস করে।

এই বইটির একটি সামাজিক চরিত্র রয়েছে, তবে এটি কোনো সমাজতান্ত্রিক ইউটোপিয়া বা কাল্পনিক আদর্শ রাষ্ট্র নয়। এতে উল্লিখিত অনেক প্রস্তাবই কর্মদক্ষতা এবং সামাজিক সূচক—উভয়ই উন্নত করতে সক্ষম। এই রচনায় এমন কিছু বিষয়ের বিরোধিতা করা হয়নি যা হয়তো সরাসরি পাঠ্যে উল্লেখ করা নেই, কিন্তু মনোযোগ দিয়ে পড়লে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, এই রচনাটি ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধী নয়। হ্যাঁ, এটি আমাদের উৎপাদিত সম্পদের ভারসাম্য ও ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়; এটি ক্ষমতা ও সম্পদের চরম কেন্দ্রীভবন হ্রাস এবং গণতন্ত্রে সামাজিক ক্ষমতার বিস্তারের পক্ষে কথা বলে। দ্বিতীয়ত, চরম মাত্রার সরকারি স্বচ্ছতা কীভাবে রাষ্ট্রীয় একনায়কতন্ত্রের হাতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে, সেদিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রস্তাবিত এই মডেলটি কোনো ধরনের সামাজিক বা শ্রমিক-শাসিত একনায়কতন্ত্রে পরিণত হতে পারে—এমন ধারণাকে এই রচনা সমর্থন করে না। তাছাড়া, এই রচনাটি

এমন কোনো সামাজিক কাঠামোর প্রত্যাশা করে না যা মানুষকে হুবহু সমান করে দেয়: এখানে পিরামিড-সদৃশ কাঠামোকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে ঠিকই, তবে লক্ষ্য হলো এমন এক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেখানে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণি একে অপরের কাছাকাছি আসতে পারে।

আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে, পুরো বইটিতে নিরাপত্তা, পুলিশ বা সামরিক বিষয়গুলোর কোনো উল্লেখ নেই। 'কমন গুড অর্ডার' বা 'সর্বজনীন কল্যাণ-ভিত্তিক ব্যবস্থা' মূলত শান্তিবাদী দর্শনে বিশ্বাসী। যেকোনো সমাজেই অপরাধের অস্তিত্ব থাকতে পারে, তবে আমাদের এমন একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়াতে হবে যা সর্বজনীন এবং সামাজিকভাবে যার জবাবদিহিতা বা নিরীক্ষা সম্ভব; যেখানে পেশাজীবীরা তাদের সামাজিক কাজের জন্য যথাযথ স্বীকৃতি পাবেন। বর্তমান নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমস্যা হলো, ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনকে চ্যালেঞ্জ করার যেকোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বারবার বলপ্রয়োগ করা। এছাড়া, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা দেখি পুলিশ বাহিনী ব্যক্তিগত স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং চরম সংকটময় মুহূর্তে যুদ্ধকে মুষ্টিমেয় সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের খেলার মতো করে দেখা হচ্ছে। একটি দায়িত্বশীল সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিকের অধিকার হওয়া উচিত একটি মুক্ত ও নিরাপদ পৃথিবীতে বসবাস করা।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বর্তমান ব্যবস্থার রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের দ্বারা এই রচনার মূল বক্তব্য বা ধারণাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার প্রবণতা। যেকোনো সামাজিক সংস্কারই প্রাসঙ্গিক, কিন্তু সরকারি পদক্ষেপ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সীমার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সর্বজনীন কল্যাণের প্রতি নৈতিক অঙ্গীকার থাকা জরুরি। সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ ছাড়া যদি এই বইটির ভুল ব্যাখ্যা করা হয়, তবে তার পরিণতি হবে শূন্যতা কিংবা হুমকি। তাই, প্রকৃত সামাজিক বিজয় অর্জনের লক্ষ্যে পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এর বিষয়বস্তু পর্যালোচনা, হালনাগাদ এবং আরও গভীর করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তবেই মুষ্টিমেয় মানুষের বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত পৃথিবীকে একটি ন্যায়ভিত্তিক ও সামাজিকভাবে মর্যাদাপূর্ণ পৃথিবীতে—যা প্রকৃত অর্থেই সবার—রূপান্তর করার বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি হবে।